কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

অক্টো—নভে '৮৬

Hard Copy & Scan - Subhajit Kundu
Edit - Optimus Prime

This e-copy is scanned and preserved by
Dhulokhela Team Members

Anyone Can Contribute to our project by
giving their rare magazines for scan.

Reach us at
optifmcybertron@gmail.com

স্কুলের বই : ১৯৮২

সাহিত্য পাঠ, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম
প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত
সাহিত্য পরিচয় ১ম ষষ্ঠ
সুশীল বসু সম্পাদিত
সাহিত্য পরিচয় ২য় ৭ম
শচীন বিশ্বাস সম্পাদিত
সাহিত্য পরিচ ৩য় ৮ম

সহায়ক পাঠ, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম
দক্ষিণারঞ্জন বসু সম্পাদিত
কাহিনী পরিচয় ১ম ষষ্ঠ
কাহিনী পরিচয় ২য় ৭ম
গল্পবিচিত্রা ৮ম

ভাষা শিক্ষা, ৭ম, ৮ম
আশিস সান্যাল ও শচীন বিশ্বাস
ভাষা পরিচয় (প্রবন্ধ ও ব্যাকরণ) ৭ম। ৮ম
পণ্ডিত শিবশঙ্কর শাস্ত্রী
ব্যাকরণ পরিচয় ষষ্ঠ

ভূগোল, ৬ষ্ঠ, ৭ম
অধ্যাপক নীলোৎপল শ্যাম
ভূগোল পরিচয় ১ম ষষ্ঠ
ভূগোল পরিচয় ২য় ৭ম

বিজ্ঞান ও গণিত
দুলাল বল
বিজ্ঞান পরিচয় ৭ম
জ্যামিতি পরিচয় ষষ্ঠ

ইতিহাস, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম
অধ্যাপক নির্মল মল্লিক চৌধুরী
সভ্যতার পরিচয় ষষ্ঠ
অধ্যাপক বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
ইতিবৃত্তিকা ৭ম
ইতিবৃত্তিকা ৮ম

সাধারণ জ্ঞান, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম
অখিল নিয়োগী সম্পাদিত
স্বপনবুড়ো বুক অব নলেজ

জীবন বিজ্ঞান, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম
অধ্যাপক তারাচাঁদ নন্দী, ডঃ শকুন্তলা নন্দী ও
অধ্যাপক দীপক নন্দী
প্রাণী ও প্রকৃতি পরিচয় ১ম ৬ষ্ঠ
প্রাণী ও প্রকৃতি পরিচয় ২য় ৭ম
প্রাণী ও প্রকৃতি পরিচয় ৩য় ৮ম

শৈব্যা পুস্তকালয়
৮/১সি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা ৭৩ . ৩৪ ৮৫৪৩

GEOGRAPHY VIII, IX, X
নীরেন সেন
ভূগোল পরিচয়

অধ্যাপক জহরলাল গুহ ও অধ্যাপক নীলোৎপল শ্যাম
মাধ্যমিক ভূগোল ১ম IX

অধ্যাপক জহরলাল গুহ ও অধ্যাপক নীলোৎপল শ্যাম
মাধ্যমিক ভূগোল ২য় X

PHYSICAL SCIENCE, IX, X
অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও
অধ্যাপক বিমলনাথ দাসঘোষ
মাধ্যমিক বিজ্ঞান ১ম IX

অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও
অধ্যাপক বিমলনাথ দাসঘোষ
মাধ্যমিক বিজ্ঞান ২য় X

LIFE SCIENCE, IX, X
অধ্যাপক তারাচাঁদ নন্দী, ডঃ বলেন নন্দী ও
অধ্যাপক সতীনাথ সেন
মাধ্যমিক জীবন বিজ্ঞান ১ম IX

অধ্যাপক সতীনাথ সেন, ডঃ বলেন নন্দী ও
অধ্যাপক তারাচাঁদ নন্দী
মাধ্যমিক জীবন বিজ্ঞান ২য় X

MATHEMATICS, VIII
ডঃ জ্ঞানেন্দ্রগোপাল চক্রবর্তী
ডঃ প্রভাতরঞ্জন ঘোষ
মাধ্যমিক পাটীগণিত ৮ম

SANSKRIT GRAMMAR
Dr. Gourinath Sastri
Essentials of Sanskrit & Composition

WORK BOOK SERIES
By A Board of Editors
Practice in Objective
Mathematics IX X
Work Book in Geography VII
Work Book in Geography VI

দি পাইওনিয়ার পাবলিকেশানস্
৮-১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা ৭৩ . ৩৪ ৮৫৪৩

চিঠিপত্র

প্রিয় সম্পাদক,
কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

মহাশয়,

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান (পূজা সংখ্যা)-এ "বিদেশে ভারতীয় বিজ্ঞানী" (লেখক রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়) নামক প্রবন্ধে কিছু ভুল চোখে পড়ল!

বিদেশে ভারতীয় বিজ্ঞানী প্রবন্ধে ডঃ অনন্তমোহন চক্রবর্তীর জন্মস্থান লেখা হয়েছে "সামতা" উপনগরীতে। কিন্তু আমার ছোট কাকা ডঃ আনন্দমোহন চক্রবর্তীর জন্ম পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার বোলপুরের সন্নিকটে সাঁইথিয়াতে। আমার কাকা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে B. Sc (Chem. Hons) পাশ করেন ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে M. Sc, Ph-D করেন।

নমস্কারান্তে—
দেবব্রত চক্রবর্তী

১৮৮/১এ, প্রিন্স আনোয়ার শা রোড
কলিকাতা-৪৫ ফোন :—৪২-৫৫৬৪

দেবব্রত চক্রবর্তী তাঁর ছোট কাকা আনন্দ মোহন চক্রবর্তীর জন্মস্থান সম্পর্কে যে ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তাতে আমরা আনন্দিত। যে উৎস (Span) থেকে ডঃ চক্রবর্তী সম্পর্কে তথ্যাদি সংগৃহীত হয়েছিল, তাতে তাঁর জন্মস্থান 'সামতা' বলে উল্লেখিত ছিল।

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

চিঠিপত্র বিভাগ খোলা হয়েছে বলে একটি পত্র লিখছি। আমি কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পত্রিকার একজন নিয়মিত কিশোর পাঠক। কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান নিঃসন্দেহে একটি উন্নতমানের পত্রিকা। এর সর্বাঙ্গীণ উন্নতি কামনা করি। এই পত্রিকার আমার সবচেয়ে ভাল লাগে 'পড়াশোনা' বিভাগ ও 'নিজে কর' বিভাগটি। কিন্তু এই বিভাগগুলো কেন অনিয়মিতভাবে প্রকাশ হয়? চতুর্থ সংখ্যায় 'পড়াশোনা' বিভাগটি ছিল না। কেবল গল্প দিয়ে ভরিয়ে এই মূল্যবান পত্রিকাটিকে ভারাক্রান্ত করে তোলার কোন মানে হয় না।

পড়াশোনার বিভাগগুলো যেন চালু থাকে। আশা করি আমার কথাগুলো বিবেচনা করে দেখবেন।

নিবেদন ইতি—
তাপসকুমার বিশ্বাস

আলিপুরদুয়ার
(উত্তরবঙ্গ)

সূচীপত্র ॥

চিঠি : ১
সম্পাদকীয় : ২
দপ্তর থেকে
পরমাণু বোমা : সমরজিৎ কর ৩
পুনর্মুদ্রণ
পশুপাখীর পরিচয় : যোগীন্দ্রনাথ সরকার ৪২
অতিকায় টিকটিকি : গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য ৭
উপন্যাস
শার্লক হোমস্ প্রফেসর চ্যালেঞ্জার ও মঙ্গলগ্রহ : অদ্রীশ বর্ধন ৪৪
পড়াশোনা
রসায়নে সহজপাঠ : অমরনাথ রায় ৯
জীবন বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ : তারকমোহন দাস ২২
উৎপাদক নির্ণয়ের সহজ পদ্ধতি : নন্দলাল মাইতি ২৪
জ্ঞান-বিজ্ঞানের নির্বাচিত রচনা
সমুদ্র-দানব অক্টোপাস : নারায়ণ চক্রবর্তী ১৬
বন চাঁড়াল গাছের রহস্য : দিবাকর সেন ২৯
বিজ্ঞানের ভেল্কি : এ. সি. সরকার ৩১
অ্যামেচার রেডিও রোমাঞ্চ : রত্না ঘোষ ৩৫
মাটি থেকে আকাশে : পার্থসারথি চক্রবর্তী ৪৯
বিজ্ঞান বিচিত্রা : অনীশ দেব ৬৫
রূপোর মূল্য : শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৩
ছবিতে গল্প
বিজ্ঞান-সাধক জগদীশচন্দ্র : দিলীপ দাস ১৮
অজানা মহাকাশে : দেবদাস ৩৩ ॥ টোয়েন্টী থাউজেণ্ড লীগস আণ্ডার দি সী : গৌতম কর্মকার ৭০
হাবুলের বিজ্ঞান ভাবনা : ধীরেন বল ৬৪
আবিষ্কারের গল্প
লাই ডিটেকটর : সুনীল সরকার ২০
প্যাডেল ঘুরিয়ে আকাশে : মতি মুখোপাধ্যায় ২৩
বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী
অধ্যাপক আবদুস সালাম : গ্যালেন : রবীন বন্দ্যোঃ ২৭
শরীর স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিজ্ঞান
কৃত্রিম ইনসুলিন : অসীম আচার্য ২৬ ॥ এলার্জী : সুনীত রায় ৫৫ ॥ কার্টুন : খুদে বৈজ্ঞানিক ৩০, ৫৪ বিজ্ঞান ক্লাব—অন্বেষা ৬৮ ॥ ভেবে ভেবে বল : শুভব্রত রায়চৌধুরী ৭২
ছোটদের দপ্তর
বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা : শ্রীবৈজ্ঞানিক ৫৮ ॥ প্রশ্নোত্তর : ৫৯ পেট্রোলিয়ামের ইতিবৃত্ত : ৬০ ॥ ভেবে বল : অনিল ঘাটা ৬১ ॥ অন্ধকারের মজার বাঁধা : স্নিগ্ধ মজুমদার ৬২ ॥ করেকটি যন্ত্রের নাম : সুবীরকুমার দাস ৬৩

যুগ্ম-সংখ্যা অক্টো-নভেঃ ১৯৮১

প্রধান সম্পাদক :
সমরজিৎ কর

সম্পাদক :
রবীন বল

সহ-সম্পাদক
জয়ন্ত দত্ত

সম্পাদকীয়

পুজোর ছুটি প্রায় শেষ। স্কুল খুললেই পরীক্ষা। রসায়ন ও গণিতের সংগে এ সংখ্যা থেকেই শুরু হয়েছে জীবন বিজ্ঞানের উপরে ধারাবাহিক রচনা। পদার্থ-বিদ্যার উপরেও শীগ্‌গির ধারাবাহিক রচনা শুরু হবে। আমাদের প্রতিশ্রুতি মতো এ সংখ্যা থেকেই 'ছোটদের দপ্তর' ও 'প্রশ্নোত্তর' বিভাগ চালু হয়েছে। যে বিভাগে তোমরা গল্প তো পাঠাতেই পারবে, এবং পড়াশোনা বিষয়ক যে কোন আলোচনাই শুরু করতে পারবে। নতুন নতুন বিভাগ খোলার পর কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান কতটা আকর্ষণীয় হল এটা কিন্তু তোমরা চিঠি দিয়ে জানাতে ভুলো না।

পরমাণু বোমা

সমরজিৎ কর

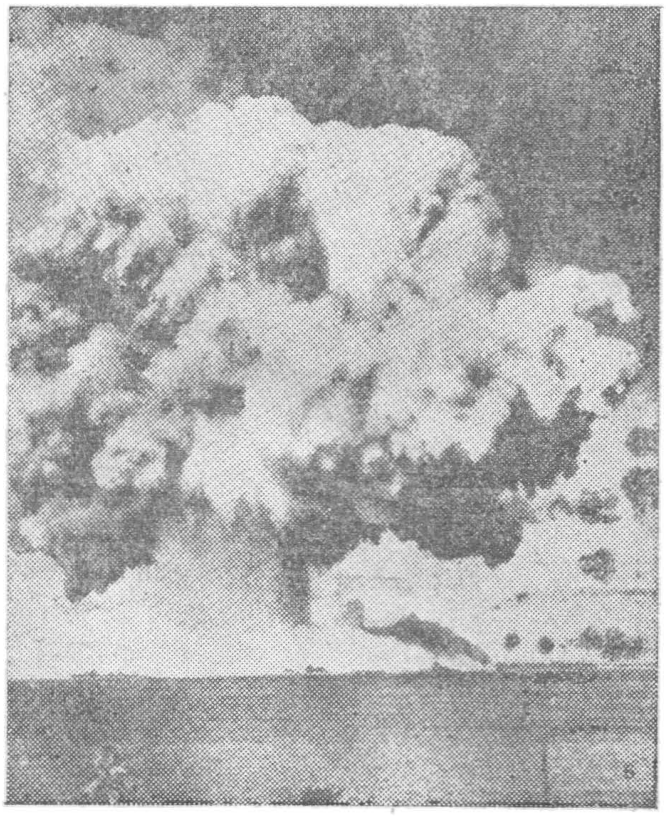

পরমাণু বোমার কথা অনেকেই তোমরা শুনে থাকবে। পৃথিবীর কোন কোন দেশ পরমাণু বোমা তৈরী করছে এমন কথা খবরের কাগজেও পড়ছ আজকাল। খুবই আতঙ্কের কথা।

কেউ কেউ হয়ত বলবে, কেন? সব রকম বোমাতেই তো প্রচুর ক্ষতি হয়। তাহলে শুধু পরমাণু বোমা নিয়ে এত মাথা ঘামানো কেন?

না। ব্যাপারটা কিন্তু অত সহজ নয়, সে কথাই বলি।

১৯৪৫ সাল। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। মার্কিন দেশের শত্রুপক্ষ জাপান। সাধারণ অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে এঁটে উঠতে না পেরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঠিক করল, জাপানকে উচিৎ শিক্ষা দেওয়া দরকার। জাপানের দুটি দ্বীপ হিরোসিমা এবং নাগাসাকি। ৬ই আগস্ট, ১৯৪৫। ওই দিন সকাল ৮টা বেজে ১৫ মিনিটে ওরা হিরোসিমার উপর নিক্ষেপ করল একটি পরমাণু বোমা। নাম 'লিটল্ বয়।' আর এর তিন দিন পর, ৯ আগস্ট ১৯৪৫ দুপুর ১১টা বেজে ২ মিনিটে আরও একটি বোমা নিক্ষেপ করা হল নাগাসাকির উপর। এই বোমাটির নাম রাখা হয়েছিল 'ফ্যাট ম্যান'। এটির ধ্বংস করার ক্ষমতা আগেরটির চেয়ে অনেক বেশী।

'লিটল্ বয়'-এ ব্যবহার করা হয় ৬০ কিলোগ্রামের মত পারমাণবিক বিস্ফোরক ইউরেনিয়াম—২৩৫। যার ৭০০ গ্রাম মাত্র বিস্ফোরণে অংশ গ্রহণ করে। 'ফ্যাট ম্যান'-এ ব্যবহার করা হয় ২০ কিলোগ্রাম প্লুটোনিয়াম—২৩৯। এটির ক্ষেত্রে বিস্ফোরণে অংশ গ্রহণ করেছিল মাত্র ১.৩ কিলোগ্রাম প্লুটোনিয়াম। 'লিটল বয়'-এর বিস্ফোরণ ক্ষমতা ছিল ১২৫০০ টন ট্রাইনাইট্রোটলুইন (টি এন টি-এর) বিস্ফোরণ ক্ষমতার সমান। 'ফ্যাট ম্যান-এর ২২০০০ টন টি এন টি-র সমতুল্য। এই টি এন টি এক ধরনের রাসায়নিক যৌগ। প্রচণ্ড বিস্ফোরক।

বোমা তো ফেলা হল। কিন্তু তারপর?

জাপানী এক গৃহবধূ। নাম ফুতাবা কিতাইয়ামা। কত আর বয়েস, বছর তেত্রিশ? একটি বি-২৯ বিমান 'লিটল বয়' কে নিক্ষেপ করার ৪৩ সেকেণ্ড পর বিস্ফোরণ ঘটল আকাশে। ফুতা দাঁড়িয়েছিলেন সেখান থেকে ১.৭ কিলোমিটার দূরে।

কে যেন চিৎকার করে বলল, প্যারাস্যুট! প্যারাসুট নামছে।

চিৎকার কানে যেতেই আকাশের দিকে চাইলেন তিনি। এক ঝলক তীব্র আলো তাঁর চোখ দুটি যেন ধাঁধিয়ে দিল। পরক্ষণেই প্রচণ্ড শব্দ। মনে হল, পায়ের নিচের মাটি যেন কেঁপে উঠল। মাটির উপর সটান পড়ে গেলেন তিনি। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে চাপা পড়লেন। চোখের সামনে অন্ধকার। সারা শরীর ভস্মস্তূপে ঢাকা। আপ্রাণ চেষ্টায় তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে কিছুটা সময় লাগলো।

সে এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতা!

মৃত্যুর পূর্বে ফুতাবা বলেছেন, ভস্মস্তূত থেকে বেরিয়ে এসেই বাতাসে কিসের যেন গন্ধ পেলাম। অসহ্য গন্ধ!

কিন্তু একি? আমার মুখের চামড়ায় প্রচণ্ড জ্বালা। অল্পক্ষণের মধ্যে সেই জ্বালা আমার দুই হাত এবং বাহুতেও ছড়িয়ে পড়ল। কনুই-এর পর থেকে নখের ডগা পর্যন্ত ফোস্কা। ডান এবং বাঁ-হাতের চামড়া দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঝুলতে লাগল। কিছুক্ষণ আগেও মাথার উপর ছিল নীল আকাশ। এখন অন্ধকার। সূর্যাস্তের সময় চারদিক যেমন দেখায়, তেমন। জঞ্জাল স্তূপের উপর দিয়ে আমি পাগলের মত ছুটতে লাগলাম। কিছুটা যেতেই সামনে পড়ল একটি সেতু। কিন্তু, হায় ভগবান! সেতুর নিচে চাইতেই মূর্ছা যাওয়ার মত অবস্থা আমার। শত শত মানুষ নদীর জলে পড়ে কীটের মত দেহ মোচড়াচ্ছে। সেখানে অগণিত মানুষের শব। জামা-কাপড় ছেঁড়া অবস্থায় শত শত মানুষ নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। আমার গায়ের জ্বালা ক্রমে অসহ্য হয়ে দাঁড়াল। আগুনে পুড়লে জ্বালা করে। কিন্তু এ জ্বালা যেন ভিন্ন রকম। আমার হাত দুটি থেকে বেরিয়ে আসছে এক ধরনের হলুদ রস। আমি ক্রমেই কুঁকড়ে যাচ্ছি। আমার পাশে এক দল স্কুলের ছেলেমেয়ে। আমার মত যন্ত্রণার জ্বালায় তারাও কুঁকড়ে যাচ্ছে। তারা 'মা, মা' বলে চিৎকার করছিল। কিন্তু কোথায় মা? একে একে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল তারা। বুঝলাম, আমার মুখের মাংসপেশী শক্ত হয়ে উঠছে। দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে আসছে। গালের উপর হাত বোলাতে গিয়ে বুঝতে পারলাম, আমার মুখ অস্বাভাবিকভাবে ফুলে উঠেছে। আশ্রয়ের আশায় আমি ছুটতে লাগলাম। আমার দু'পাশে আহতদের স্ট্রেচারে করে বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে গাড়ী এবং ট্রাক বোঝাই শবদেহ। আর রাস্তার দু'পাশ দিয়ে হেঁটে চলেছে অজস্র স্ত্রী-পুরুষ। সবাই যেন নিশি পাওয়া মানুষ।

হিরোসিমার জনসংখ্যা ছিল ৩৫০০০০। যেখানে বিস্ফোরণ ঘটে সেখান থেকে এক কিলোমিটারের মধ্যে যারা বাস করছিল তাদের শতকরা ষাটজন চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে মারা যায়। যারা বেঁচে ছিল তাদের শতকরা নব্বইজন মারা পড়ে পরবর্তী দশ দিনের মধ্যে। ১৯৪৫ এর শেষাশেষি মৃতের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৪০০০০।

আর নাগাসাকির অবস্থাটা? সেখানকার জনসংখ্যা ছিল ২৮০০০০। বছর শেষ না হতে সেখানে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৪০০০।

বোমা ফাটলে মুহূর্তে আশপাশের বাতাসে কেমন একটা চাপ সৃষ্টি হয়, নিশ্চয় অনেকে সেটা তোমরা লক্ষ করেছ। বড়সড় একটি পটকা ফাটাও, দেখবে হঠাৎ বাতাসে কেমন ধাক্কা সৃষ্টি হল। সেই ধাক্কায় আশপাশে ছড়িয়ে থাকা কাগজের টুকরো, লতাপাতা কেমন ছিটকে পড়ে। এমনটি বোমা ফাটলেও ঘটে। হ্যাঁ, হিরোসিমা নাগাসাকিতে পরমাণু বোমার বিস্ফোরণের সময় এই ধাক্কার পরিমাণটা সে কত প্রবল ছিল, ভাবলেও তোমরা অবাক হবে। বিস্ফোরণের দরুন যে শক্তি বেরিয়ে আসে তার অর্ধেক ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের বাতাসে। সেই ধাক্কা বাতাসে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে। তার ধাক্কায় মনে হল বিস্ফোরণের জায়গা থেকে বাতাসের এক একটি প্রাচীর যেন শব্দের চেয়েও দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে। ১১ কিলোমিটার যেতে সময় নেয় ৩০ সেকেণ্ড। সেই শব্দের দাপটে হাজার হাজার ঘর-বাড়ি নিমেষে লোপাট হয়ে গেল।

এই সঙ্গে ঘটল আরও একটি ব্যাপার। বিস্ফোরণের জায়গায় এক ঝাপটায় বাতাস ফাঁকা। দেখা দিল প্রচণ্ড নিম্নচাপ সেখানে। ফলে কিছুক্ষণ পর সেখানে ছুটে আসতে লাগল বাইরের বাতাস। অর্থাৎ গোড়ায় যেমন ঝড়ের ঝাপটা বিস্ফোরণের জায়গাটি থেকে দূরে ছড়িয়ে পড়ে। এবার যে ঝড় শুরু হলো, তার ঝাপটা দূরবর্তী অঞ্চল থেকে ধেয়ে এলো বিস্ফোরণের জায়গায়। এই ঝড়ের বেগ দাঁড়ায় ঘন্টায় ২৫২ কিলোমিটার। আর সেই বাতাসের চাপ দাঁড়ায় প্রতিবর্গ মিটারে তিন টনের মত। যার তোড়ে মুহূর্তে সমস্ত ঘর-বাড়ি গুঁড়িয়ে গেল।

পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ শক্তির এক তৃতীয়াংশ রূপান্তরিত হয় উত্তাপে। এই উত্তাপ বাতাসে সৃষ্টি করল অগ্নিগোলক। মুহূর্তে সেই অগ্নিগোলকের তাপমাত্রা উঠে দাঁড়াল দশ লক্ষ সেলসিয়াস। আর এক সেকেণ্ডের মধ্যে গোলকটির ব্যাস বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ২৮০ মিটার। বিশেষজ্ঞরা পরে বলেছেন, হিরোসিমায় নিক্ষিপ্ত বোমাটি থেকে মাত্র তিন সেকেণ্ডের মধ্যে যে পরিমাণ উত্তাপ নির্গত হয় তা ওই সময়ে সূর্য থেকে যতটা উত্তাপ নির্গত হয় তার কুড়ি গুণেরও বেশী। নাগাসাকির বোমা থেকে এর দ্বিগুণ পরিমাণ তাপ নির্গত হয়।

ফলে বিস্ফোরণের জায়গাটি থেকে ৩·৫ কিলোমিটারের মধ্যে যারা বাস করছিল তাদের গায়ের চামড়া ঝলসে যায়। প্রলয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে যায় প্রচুর সম্পত্তি।

হিরোসিমায় বাড়ির সংখ্যা ছিল ৭৬০০০। বাতাসের তোড়ে এবং আগুনে তাদের শতকরা ৬৮ ভাগ ধ্বংস হয়। ২৪ ভাগ ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নাগাসাকিতে বাড়ি ছিল ৫০০০০। ২৫ শতাংশ ধ্বংস হয়, ১১ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্ত। এ ছাড়া আশপাশে জ্বলে উঠল দাউ দাউ

আগুন। কাঠ গাছপালা ভস্মে পরিণত হলো। নদী এবং পুকুরের জল বাষ্পীভূত হয়ে সোজা উঠে গেল আকাশ পানে। সেখানে গিয়ে ঠাণ্ডা বাতাসের সংস্পর্শে এসে রূপান্তরিত হল বৃষ্টি বিন্দুতে। সেই বৃষ্টি ঝরে পড়ল শহর এবং তার আশপাশে। বর্ষাই বটে। তবে ভিন্ন জাতের বর্ষা। বৃষ্টির জলের রঙ ছিল কালো। তেজস্ক্রিয়। এই বর্ষার নাম দেওয়া হয় 'ব্ল্যাক রেইন' বা কালো বর্ষা।

এর পরও আছে সেই রাক্ষসী ব্যাপারটা। সাধারণ বোমা ফাটলেও আগুন ছড়ায়, বাতাসে সৃষ্টি হয় প্রচণ্ড ধাক্কা। কিন্তু পরমাণু বোমার বিস্ফোরণে এ সব ছাড়াও নির্গত হয় আরও এক ধরনের ভয়াবহ বস্তু। তেজস্ক্রিয় বিকিরণ। গামা রশ্মি, একস্ রশ্মি, প্রভৃতি। এছাড়া নিউট্রনের মত তেজস্ক্রিয় কণা। হিরোসিমা এবং নাগাসাকির বোমার ১৫ শতাংশ শক্তি নির্গত হয়েছিল তেজস্ক্রিয় রশ্মি এবং কণা হিসেবে। প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন নিউট্রন কণা মাটি, ঘরবাড়ির ইঁট পাথরে আঘাত করে সৃষ্টি করে তেজস্ক্রিয় 'আইসোটোপ' বা সমস্থানিক পদার্থ। বিস্ফোরণ ঘটে যাওয়ার পরও দীর্ঘদিন ধরে ওই সব 'আইসোটোপ' থেকে নিয়মিত তেজস্ক্রিয় বিকিরণ নির্গত হতে থাকে। এখনও হচ্ছে। এই বিকিরণ জীবজগতের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর।

এখানে একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। বস্তুর ওজন মাপতে আমরা একক হিসেবে ধরে নিই 'গ্রাম'। আয়তনের একক 'লিটার।' তেমনি কারোর শরীরে, কতটা তেজস্ক্রিয় বিকিরণ পড়ল সেটা মাপার জন্যে বিজ্ঞানীরা এক ধরনের 'একক' ধরে নিয়েছেন। যার নাম 'র‍্যাড'। পঞ্চাশজন মানুষকে হত্যা করতে গেলে ৭০০ র‍্যাড বিকিরণই যথেষ্ট। পর্যবেক্ষকরা বলেছেন, হিরোসিমায় বোমা বিস্ফোরণের মুহূর্তে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের মাত্রা দাঁড়িয়েছিল ৬০০০ র‍্যাড। আর নাগাসাকিতে ৮০০০ র‍্যাড। তবে হ্যাঁ, তখন যে সব আইসোটোপ তৈরি হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে থাকে, পরে বছরের পর বছর তারাও পরিবেশের মধ্যে ছড়িয়ে দেয় তেজস্ক্রিয় বিকিরণ। এখনও দিচ্ছে।

এর ফলে অনেকের মধ্যে দেখা দেয় বিকিরণ জনিত অসুস্থতার লক্ষণ—গা গোলান এবং বমি। কয়েক দিনের মধ্যে অনেকে রক্ত বমিও করতে থাকে। দেখা দেয় জ্বর এবং উদরাময়। পায়খানার সঙ্গে পড়তে থাকে রক্ত। এবং তার দশ দিনের মধ্যেই মৃত্যু।

যাদের দেহে বিকিরণের মাত্রা কম ছিল, তাদের দাঁতের গোড়া এবং নাক দিয়ে রক্ত পড়ে। চুল পড়তে থাকে। জ্বর এবং দুর্বলতা। তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। মৃত্যু এসে গ্রাস করে।

এতো গেল তখনকার ব্যাপার। যারা মরল না, পরে তাদের মধ্যে দেখা দিল নানা রকম দুরারোগ্য ব্যাধি। মানসিক রোগ, চোখের রোগ, নানা রকম ক্যানসার। দেখা গেছে, ওই সময় যারা হিরোসিমা এবং নাগাসাকিতে বাস করছিল এবং এখনও বেঁচে আছে, তাদের অনেকেই এখন থাইরয়েড, ফুসফুস, জিহ্বার লালা-গ্রন্থি, অস্থি, প্রস্টেট, রক্ত প্রভৃতির ক্যানসার রোগে ভুগছে। বোমা পড়ার সময় যে সব মায়ের পেটে সন্তান ছিল, সেই সব সন্তানেরই বেশির ভাগই জন্মেছে বিকলাঙ্গ হয়ে। কারোর মাথা ছোট, কেউ জড়বুদ্ধি সম্পন্ন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ওদের বংশধরদের মধ্যেও অনেকে বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মাবে।

তাই বলছিলাম, পরমাণু বোমা মানেই আতঙ্ক। পরমাণু তেজস্ক্রিয় বিকিরণ জলের মাছ বিষাক্ত করে, পশুপাখির শরীরে দুরারোগ্য রোগ ঘটায়, তার প্রভাবে দীর্ঘকাল ধরে চলে জীবজগতে অকল্পনীয় ক্ষয়ক্ষতি। পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষ এর জন্যেই পরমাণু বোমা নিয়ে এত মাথা ঘামায়। তারা কেউই চায় না হিরোসিমা এবং নাগাসাকির মত ঘটনা আবার ঘটুক।

এই দেখ, আমার
জন্মদিনের উপহার

ইউকোব্যাঙ্ক-এর
পাসবই

ভারী মজার। এই একটা উপহার আমাকে বছর বছর উপহার এনে দেবে। ইউকোব্যা পাস বইয়ের মজাই তো ঐখানে।

ভাগ্যিস্, মার মাথায় বুদ্ধিটা এসেছিল। অবশ্য ইউকোব্যাঙ্ককেও ধন্যবাদ দিই—আমার জমা পয়সা বছর বছর বাড়িয়ে তোলার জন্যে।

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

ইউকোব্যাঙ্ক কাছেই আছে, ইউকোব্যাঙ্কে টাকা জমান

UCO/CAS-69/C0 BEN

অতিকায় টিকটিকি

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

টিকটিকি তোমাদের কাছে অপরিচিত নয়। দেয়ালে, আনাচে কানাচে শিকারের সন্ধানে টিকটিকির আনাগোনা নিশ্চয়ই তোমাদের নজরে পড়েছে। দেখেছ তো মসৃণ খাঁড়া কাচের গা বেয়ে কিরকম সহজভাবে এরা ছুটাছুটি করে বেড়ায়। টিকটিকির লড়াই দেখেছ কি? সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। এরা পরস্পরকে যথা সম্ভব এড়িয়ে চলে. কিন্তু দৈবাৎ কাছাকাছি এসে পড়লেই উভয়ের মধ্যে লড়াই বেঁধে যায়। মুখে মুখে কামড়ে ধরে এদিক-ওদিক গড়াগড়ি দিতে থাকে। অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রতিদ্বন্দ্বী কাব হয়ে পড়লে লেজটাকে খসিয়ে ফেলে প্রাণপণে ছুটে পালিয়ে যায়। শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও লেজটা কিন্তু জীবন্ত প্রাণীর মতই অনেকক্ষণ ধরে ছটফট করতে থাকে। শত্রুর কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্যে এটিই হলো ওদের বিশিষ্ট কৌশল। ছিন্ন লাঙ্গুলের ছটফটানিতে বিভ্রান্ত হয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শত্রুপক্ষ লেজের মালিকের কথা বিস্মৃত হয়। টিকটিকির এসব অদ্ভুত স্বভাবের বিষয় তোমাদের অনেকেরই হয়তো নজরে পড়ে থাকবে। এজন্যে এসব সাধারণ টিকটিকির কথা না বলে আজ তোমাদিগকে টিকটিকির মত দেখতে আমাদের দেশের একরকম অতিকায় প্রাণীর কথা বলছি। আমাদের দেশের এই অতিকায় টিকটিকির মত প্রাণীরা গোসাপ নামে পরিচিত।

মানুষ যখন পৃথিবীতে আবির্ভূত হয় নি সেই মেসোজোয়িক যুগে টিকটিকির মত দেখতে অতিকায় সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীরাই পৃথিবীর বুকে বিচরণ করতো। যে যুগের বজ্র টিকটিকি, আগুনে টিকটিকি; বর্ম টিকটিকি, যারা সাধারণতঃ ডাইনোসোর, ব্রনটোসোরাস, টাইরেনোসোরাস, ডিপ্লোডোকাস নামে পরিচিত—এক একটা বিশাল আকৃতির প্রাণী ছিল। ব্রনটোসোরাসগুলো প্রায় ৬০/৭০ ফুট লম্বা হতো। ডিপ্লোডোকাসগুলোর শরীরের দৈর্ঘ্য হতো ৯০ থেকে ১০০ ফুটেরও বেশী। এই বিশাল আকৃতির সরীসৃপগুলোর শিলীভূত কঙ্কাল আবিষ্কৃত না হলে কেউ ধারণায়ও আনতে পারতো না

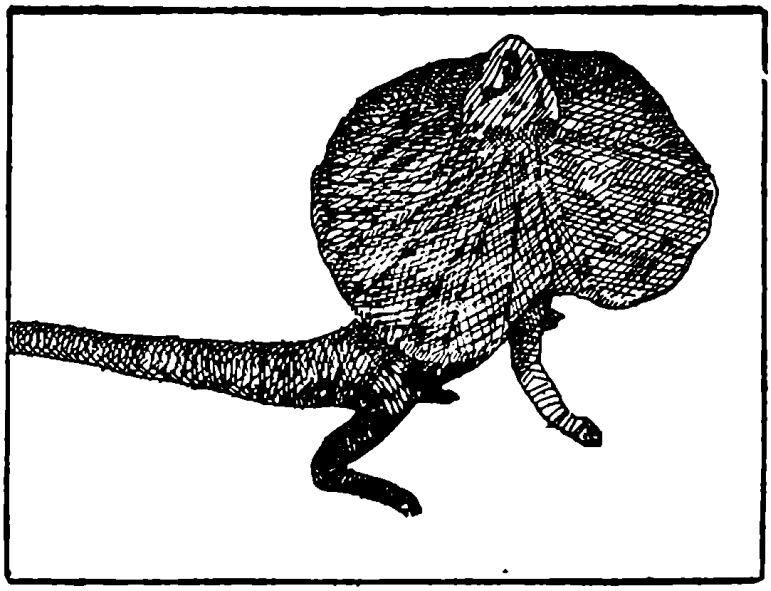

অস্ট্রেলিয়ার ঝালরওয়ালা টিকটিকি শত্রুর দিকে রুখে দাঁড়িয়েছে।

যে, কোন দিন পৃথিবীর বুকে আধিপত্য বিস্তার করেছিল এ রকমের জানোয়ার। এই বিশালকায় জানোয়ারেরা সুদূর অতীতে পৃথিবীর বুক থেকে লুপ্ত হয়ে গেলেও আধুনিক যুগের গোসাপ প্রভৃতি অতিকায় টিকটিকির মত জানোয়ারগুলো হয়তো তাদেরই পরিবর্তিত আকৃতির বংশধর। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন আকৃতির রকমারি অতিকায় টিকটিকি জাতীয় জানোয়ার দেখা যায়। এদের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার সরীসৃপগুলোর আকৃতি-প্রকৃতি বিশেষ বৈশিষ্ট্যব্যঞ্জক। গলায় ঝালরওয়ালা অস্ট্রেলিয়ার অতিকায় টিকটিকিগুলো পিছনের দু-পায়ে ভর দিয়ে খাড়াভাবে ছুটে যেতে পারে। শত্রুকর্তৃক আক্রান্ত হলে গলার ঝালরটাকে ছত্রাকারে প্রসারিত করে দু-পায়ে ভর দিয়ে শত্রুর দিকে রুখে দাঁড়ায়। অস্ট্রেলিয়ার কোন কোন জাতের গোসাপ উত্তেজিত হলেই পিছনের দু-পা ও লেজের উপর ভর দিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে। অস্ট্রেলিয়ার একজাতের গোসাপই বোধহয় লম্বায় সবচেয়ে বড় হয়। এদের বিশাল আকৃতিই প্রাগৈতিহাসিক যুগের বজ্র টিকটিকি প্রভৃতি সরীসৃপদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

আমাদের দেশে সাধারণতঃই ধূসর এবং কালো-হলদে রঙে বিচিত্রিত দু-রকমের গোসাপ দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশের কালো-হলদে রঙে বিচিত্রিত গোসাপগুলো প্রায় তিন-চার হাত লম্বা হয়। খাদ্যের অন্বেষণে এরা বেশীর ভাগ সময় জলেই বিচরণ করে। কদাচিৎ ডাঙ্গায় উঠে আসে। কিন্তু আমাদের দেশে লোকালয়ের আশে-

পাশে, বনে-জঙ্গলে ধূসর বর্ণের গোসাপগুলোকে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়। নেহাৎ দায়ে না পড়লে ডাঙা ছেড়ে এরা সহজে জলে নামে না। ছুঁচো, ইঁদুর, পাখী এবং ছোটো খাটো প্রাণীর মৃতদেহ, ডিম, কোঁচো, সাপ প্রভৃতি এদের খাদ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত। কখনও যদি তোমাদের নজরে পড়ে তবে লক্ষ্য করে দেখো—খাদ্যের সন্ধানে ঘোররাফেরা করবার সময় সাপের জিপের মত চেরা লক্‌লকে একটা লম্বা জিভ অনবরত মুখ থেকে বের করছে এবং সঙ্গে সঙ্গেই ভিতরে টেনে নিচ্ছে। কচ্ছপের ডিমের উপর এদের লোভ খুব প্রবল। রাত্রি বেলায় ডাঙ্গায় উঠে জলের ধারে নরম মাটিতে গর্ত খুঁড়ে কচ্ছপ এক সঙ্গে অনেকগুলো ডিম পেড়ে গর্তের মুখ বুজিয়ে দিয়ে যায়। কিন্তু গোসাপের নজর এড়ানো দুষ্কর! ভোর হতে না হতেই গোসাপ এসে ডিমগুলোকে উদারসাৎ করবেই!

নির্বিষ কি বিষধর, সব রকম সাপেরই শত্রু—এই গোসাপ। গোসাপের সঙ্গে একবার একটা গোখরো সাপের লড়াই নজরে পড়েছিল। দুপুর বেলায় একদিন পাড়াগাঁয়ের একটা খালের ধারে ঝোপঝাড়ের মধ্য থেকে হঠাৎ একটা অস্বাভাবিক হিস্ হিস্ শব্দ কানে গেল। একটু থমকে দাঁড়াতেই দু-একটা ঢপ্ ঢপ্ আওয়াজ শুনতে পেলাম। ব্যাপারটা কি—এদিক-ওদিক উঁকিঝুঁকি মেরে দেখবার চেষ্টা করতেই ঝোপের একপাশে পরিষ্কার জায়গায় একটা অদ্ভুত দৃশ্য নজরে পড়লো। ধূসর বর্ণের বেশ বড় একটা গোসাপ একটা গোখরো সাপের লেজ কামড়ে ধরে মুখ থুবড়ে যেন মড়ার মত পড়ে আছে। সাপটা মাথা নীচু করে অনবরত সামনের দিকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে; কিন্তু গোসাপটার কবলমুক্ত হতে না পেরে ভীষণ ক্রোধে উল্টে এসে ফণা তুলে তার পিঠের উপর প্রচণ্ড বেগে ছোবল মারছিল। এই ছোবলেরই ঢপ্ ঢপ্ আওয়াজ বেশ দূর থেকেও শোনা যাচ্ছিল। প্রায় পনেরো-বিশ মিনিট ধরে নিষ্ফল আক্রোশে সাপটার গর্জন এবং ছোবল মারবার দৃশ্য দেখলাম। সাপটা যেন ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে আসছিল। গোসাপও এতক্ষণ একভাবেই চুপটি করে পড়েছিল। এবার মুখটাকে তুলে গলা ফুলিয়ে যেন ভীষণ মূর্তি ধারণ করলো। সাপটার লেজের বেশ খানিকটা মুখের ভিতর চলে গেছে। সেই অবস্থাতেই সাপটাকে মাটিতে আছাড় মারতে লাগলো। একবার এদিকে, আবার ওদিকে আছাড় মারে। পাঁচ-সাত বার আছাড়ের চোটেই সাপটা যেন দড়ির মত নেতিয়ে পড়লো। এদিকে গোসাপও তাকে একটু একটু করে ঢোকে ঢোকে গিলছে। নির্জীব হলে কি হবে, সাপটা তখনও মোচড় দিয়ে স্প্রিং-এর মত পাক খাচ্ছিল। সবসমেত প্রায় ঘণ্টাখানেক সময়ের মধ্যে অতবড় সাপটা গোসাপেরর মুখগহ্বরে বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়—সাপটার এতগুলো ছোবলের পরও গোসাপটার কিছুমাত্র অনিষ্ট হলো না কেন? একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছিলাম—সাপটার সবগুলো ছোবলই যে গোসাপটার গায়ে পড়ছিল তা নয়, মাটির উপরও এলোমেলোভাবে দু-একটা ছোবল পড়ছিল। প্রথম আক্রমণের সময় কি ঘটেছিল সেটা দেখবার অবশ্য সুযোগ হয় নি। হয়তো প্রথম দিকের ছোবল মাটিতে পড়বার ফলে সাপটার বিষদাঁত ভেঙে বিষও নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল। সেইজন্যই বোধহয় বার বার আঘাত সত্ত্বেও গোসাপটার কিছুই অনিষ্ট হয় নি।

গোসাপ সর্বদাই একাকী বিচরণ করে। এরা পরস্পরের সান্নিধ্য মোটেই সহ্য করতে পারে না। দৈবাৎ দুটিতে সামনাসামনি দেখা হয়ে গেলেই মুস্কিল। ঝগড়া বেঁধে যাবেই! উভয়ের ফোঁসফোঁসানিতে, লেজের প্রবল আঘাতে বনজঙ্গল তোলপাড় হয়ে ওঠে। গোসাপের লড়াইয়ের তীব্রতা বৃদ্ধি পায় প্রজনন ঋতুতে। সময় সময় দু-তিন দিন ধরে প্রচণ্ড লড়াই চলতে থাকে। পিছনের পা ও লেজের উপর ভর দিয়ে খাড়া হয়ে পরস্পর জড়াজড়ি করে ভীষণ মল্লযুদ্ধ বেঁধে যায়। সে সময় লোকজন কাউকে এরা গ্রাহ্যই করে না। শিকারী কুকুরগুলো পর্যন্ত এদের কাছে যেতে ভয় পায়—এমনই এদের লেজের দাপট! যুদ্ধে যার হার হয় সেটা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে বনজঙ্গল দলিতমথিত করে ছুটতে থাকে। পিছনে ধাবমান শত্রুর দৃষ্টি বহির্ভূত হতে না পারলে তার আর রক্ষা নেই।

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' হইতে পুনর্মুদ্রিত

রসায়নের সহজপাঠ

অমরনাথ রায়

যোজ্যতা কাকে বলে, কতো রকমের যোজ্যতা আছে, কোন্ মৌলের ও কোন্ মূলকের যোজ্যতা কতো—এ সব কথা আগের অধ্যায়ে বলা হয়েছে। এবারে রসায়ন বিজ্ঞানে যোজ্যতার ব্যবহারিক প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা শুরু করা যাক্।

যোজ্যতার ব্যবহারিক প্রয়োগ :

যোজ্যতা অনুসারে বিভিন্ন মৌল ও মূলকগুলিকে শ্রেণীবিভাগ করার ফলে রসায়ন বিজ্ঞান পাঠ সহজতর হয়েছে। যোজ্যতার সাহায্যে যে কোন যৌগেরই আণবিক সংকেত শুদ্ধভাবে এবং সহজে প্রকাশ করা যায়। কি ভাবে এটা করা যায়, তা জানবার আগে কয়েকটি বিষয় মনে রাখা দরকার।

সাধারণতঃ দেখা যায় যে, এক পরমাণু একযোজী মৌল কিংবা একটি একযোজী মূলক, এক পরমাণু এক-যোজী মৌল কিংবা মূলকের সঙ্গে রাসায়নিকভাবে সংযুক্ত হয়। এইরকম সংযুক্তির ফলে যে সব যৌগ উৎপন্ন হয়, তাদের মধ্যে সিলভার ক্লোরাইড (AgCl), পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড (KOH), সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl) এবং হাইড্রোজেন ক্লোরাইড (HCl) অন্যতম।

অনুরূপভাবে এক পরমাণু দ্বি-যোজী মৌল বা একটি দ্বি-যোজী যৌগমূলক, দুই পরমাণু একযোজী মৌল কিংবা দুটি একযোজী যৌগমূলকের সঙ্গে রাসায়নিকভাবে সংযুক্ত হয়ে থাকে। অথবা এক পরমাণু দ্বি-যোজী মৌল এক পরমাণু দ্বি-যোজী মৌলের কিংবা একটিমাত্র দ্বি-যোজী যৌগমূলকের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে।—এই রকম রাসায়নিক সংযুক্তির ফলে যে সব যৌগ উৎপন্ন হয়, তাদের মধ্যে সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4), জিংক সালফেট ($ZuSO_4$), ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ($CaCl_2$), জল (H_2O) এবং ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড (MgO) অন্যতম।

একই নিয়মে এক পরমাণু ত্রি-যোজী মৌল কিংবা একটি ত্রি-যোজী মূলক তিন পরমাণু একযোজী মৌল বা তিনটি একযোজী মূলকের সঙ্গে অথবা এক পরমাণু দ্বিযোজী মৌল বা একটি ত্রি-যোজী মূলকের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে।—এই রকম রাসায়নিক সংযুক্তির ফলে উৎপন্ন হয় অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড [$Al(OH)_3$], ফসফোরিক অ্যাসিড (H_3PO_4), অ্যামোনিয়া (NH_3), অ্যালুমিনিয়াম নাইট্রাইড (AlN), অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড ($AlCl_3$) ইত্যাদি যৌগ।

দুই পরমাণু ত্রি-যোজী মৌল আবার তিন পরমাণুর দ্বি-যোজী মৌলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড (Al_2O_3), ফেরিক অক্সাইড (Fe_2O_3) ইত্যাদি যৌগ গঠন করে।

এই নিয়মগুলি উচ্চতর যোজ্যতা সম্পন্ন মৌল বা মূলকের সংযুক্তির দ্বারা যৌগ গঠনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। মন দিয়ে এই নিয়মগুলির পর্যালোচনা করলে যোজ্যতার সাহায্যে শুদ্ধভাবে যৌগের সংকেত প্রকাশের একটা সাধারণ নিয়ম খাড়া করা যায়। সেই নিয়মটি হলো এইরকম :

মনে করা যাক্, দু'টি মৌল M এবং N পরস্পরের সঙ্গে রাসায়নিকভাবে সংযুক্ত হবে। M মৌলের যোজ্যতা x এবং N মৌলের যোজ্যতা y হ'লে ঐ দুই মৌলের সংযোগে গড়া যৌগের আণবিক সংকেত হবে M_yN_x.

—কি ক'রে এটা হলো, তা দেখা যাক। M মৌলের যোজ্যতা যত, সেই সংখ্যাটি N মৌলের ডান দিকে একটু নীচে লিখে এবং N মৌলের যোজ্যতা যত, তা M মৌলের ডান দিকে একটু নীচে লিখলেই M ও N মৌল দ্বারা গড়া যৌগের শুদ্ধ আণবিক সংকেত (এক্ষেত্রে M_yN_x) পাওয়া যায়।

এইভাবে উৎপন্ন যৌগিক পদার্থের অণুর সংকেত এমন হয়, যাতে M মৌলের মোট যোজ্যতার সংখ্যা N মৌলের মোট যোজ্যতা-সংখ্যার সমান হয়। মোট যোজ্যতা বলতে আমরা বুঝি—প্রতিটি অণু গঠনকারী উপাদান-মৌলগুলির (এক্ষেত্রে M এবং N-এর) যোজ্যতা ও পরমাণু-সংখ্যার গুণফলকে। অর্থাৎ M মৌলের মোট যোজ্যতা = N মৌলের মোট যোজ্যতা। অথবা, M মৌলের যোজ্যতা × M মৌলের পরমাণু সংখ্যা = N মৌলের যোজ্যতা × N মৌলের পরমাণু সংখ্যা।

অথবা $\frac{\text{M মৌলের যোজ্যতা}}{\text{N মৌলের যোজ্যতা}} = \frac{\text{N মৌলের পরমাণু সংখ্যা}}{\text{M মৌলের পরমাণু সংখ্যা}}$

যৌগমূলকের ক্ষেত্রেও এই নিয়মটি প্রযোজ্য। আর একটি কথা মনে রাখা দরকার। যোজ্যতা জ্ঞাপক সংখ্যা এক (1) হ'লে যৌগের আণবিক সংকেতে তা লেখার

প্রয়োজন হয় না। এক যোজ্যতাকে যৌগের সংকেতে উহ্য রাখা হয়। এ ভিন্ন, উপরের নিয়মগুলি অনুসরণ ক'রে কোন যৌগের আণবিক সংকেত লেখার পর যোজ্যতা—সংখ্যাগুলি যদি কোন সাধারণ গুণনীয়ক দ্বারা বিভাজ্য হয়, সেক্ষেত্রে ঐ সাধারণ গুণনীয়ক দিয়ে যোজ্যতা সংখ্যাগুলিকে ভাগ ক'রে নিয়ে সংকেতটিকে লিখতে হয়।

একটা উদাহরণ দিলে বক্তব্যটা স্পষ্ট হবে। Zu-এর যোজ্যতা দুই। আবার SO_4 মূলকের যোজ্যতাও দুই। অতএব Zu এবং SO_4 মূলকের সংযোগে 'জিংক সালফেট' যৌগ গঠনের প্রক্রিয়াটি হবে এই রকম:

$$Zu\ (2).\ SO_4\ (2) \rightarrow Zu_2(SO_4)_2 \rightarrow Zu\ SO_4$$

এখানে আর একটি কথা মনে রাখা দরকার। কোন যৌগের আণবিক সংকেত লিখবার সময় ধাতব মৌলের (অ্যামোনিয়াম মূলকসহ) চিহ্ন বাঁ দিকে এবং অধাতব মৌলের ও অধাতব মূলকের চিহ্ন ডান দিকে লিখতে হয়।

"যৌগের অণুতে পরমাণু—সংখ্যার অনুপাত তাদের যোজ্যতার বিপরীত অনুপাতে হবে" অর্থাৎ অণুতে যোজ্যতার বিপরীত অনুপাতে পরমাণু সংখ্যা থাকবে—এই নিয়মটির অবশ্য কিছু ব্যতিক্রম আছে। জৈব যৌগের অণুতে এবং যে সমস্ত অণুতে দু'টি একই রকমের পরমাণু সরাসরি যুক্ত, যেমন H_2O_2, N_2H_4, C_2H_6 ইত্যাদি, সেখানে এই নিয়মটি খাটে না।

যোজ্যতার সাহায্যে যৌগের আণবিক সংকেত শুদ্ধভাবে লেখার কৌশল নীচের উদাহরণগুলি লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে।

যৌগের নাম	যৌগের মধ্যে পরমাণু / মূলকগুলির যোজ্যতা			যৌগের আণবিক সংকেত
সোডিয়াম ক্লোরাইড	Na = 1	;	Cl = 1	NaCl
পটাসিয়াম ক্রোমেট	K = 1	;	$CrO_4 = 2$	K_2CrO_4
কিউপ্রাস সালফেট	Cu = 1	;	$SO_4 = 2$	Cu_2SO_4
সোডিয়াম ফসফেট	Na = 1	;	$PO_4 = 3$	Na_3PO_4
পটাসিয়াম ফেরোসায়ানাইড	K = 1	;	$[Fe(CN)_6] = 4$	$K_4Fe(CN)_6$
ক্যালসিয়াম নাইট্রাইড	Ca = 2	;	N = 3	Ca_3N_2
অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড	Al = 3	;	O = 2	Al_2O_3
ফসফরাস পেণ্টক্সাইড	p = 5	;	O = 2	P_2O_5
স্ট্যানাস ক্লোরাইড	Sn = 2	;	Cl = 1	$SnCl_2$
স্ট্যানিক ক্লোরাইড	Sn = 4	;	Cl = 1	$SnCl_4$
অ্যামোনিয়াম সালফেট	$NH_4 = 1$	;	$SO_4 = 2$	$(NH_4)_2SO_4$
পটাসিয়াম ডাইক্রোমেট	K = 1	;	$Cr_2O_7 = 2$	$K_2Cr_2O_7$
ক্যালসিয়াম বাই সালফেট	Ca = 2	;	$HSO_4 = 1$	$Ca(HSO_4)_2$
ফেরিক সালফাইড	Fe = 3	;	S = 2	Fe_2S_3
পটাসিয়াম কার্বনেট	K = 1	;	$CO_3 = 2$	K_2CO_3
অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট	$NH_4 = 1$	;	$NO_3 = 1$	NH_4NO_3

নীচে কতকগুলি যৌগের নাম ও আণবিক সংকেত দেওয়া হলো।

যৌগের সাধারণ নাম	যৌগের রাসায়নিক নাম	যৌগের আণবিক সংকেত
পটাশ অ্যালাম	হাইড্রেটেড (সোদক) পটাসিয়াম-অ্যালুমিনিয়াম সালফেট	K_2SO_4, $Al_2(SO_4)_3$, $24H_2O$
বেকিং সোডা	সোডিয়াম বাই কার্বনেট	$NaHCO_3$
ব্লিচিং পাউডার	ক্যালসিয়াম ক্লোরো হাইপোক্লোরাইট	$Ca(OCl)Cl$
বোরাক্স	সোডিয়াম টেট্রাবোরেট ডেকাহাইড্রেট	$Na_2B_4O_7$, $10H_2O$
ব্লু-ভিট্রিয়ল	কপার সালফেট পেন্টাহাইড্রেট	$CuSO_4$, $5H_2O$
কস্টিক পটাশ	পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড	KOH
কস্টিক সোডা	সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড	$NaOH$
সাধারণ লবণ	সোডিয়াম ক্লোরাইড	$NaCl$
লাইম স্টোন বা চক্ বা মার্বল	ক্যালসিয়াম কার্বনেট	$CaCO_3$
চিলি সল্টপিটার	সোডিয়াম নাইট্রেট	$NaNO_3$
ক্যালোমেল	মারকিউরাস ক্লোরাইড	Hg_2Cl_2
করোসিভ সাবলিমেট	মারকিউরিক ক্লোরাইড	$HgCl_2$
ড্রাই আইস	কঠিন কার্বন ডাই অক্সাইড	CO_2
ইপসম সল্ট	ম্যাগনেসিয়াম সালফেট হেপ্টাহাইড্রেট	$MgSO_4$, $7H_2O$
গ্লবার সল্ট	সোডিয়াম সালফেট ডেকাহাইড্রেট	Na_2SO_4, $10H_2O$
হাইপো	সোডিয়াম থায়োসালফেট পেন্টাহাইড্রেট	$Na_2S_2O_3$, $5H_2O$
কুইক লাইম	ক্যালসিয়াম অক্সাইড	CaO
স্লেকড লাইম	ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড	$Ca(OH)_2$
লিথার্জ	হলুদ বর্ণের লেড মনক্সাইড	PbO
লুনার কস্টিক	সিলভার নাইট্রেট	$AgNO_3$
মিল্ক অফ ম্যাগনেসিয়া	ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রক্সাইড	$Mg(OH)_2$
মোর্স সল্ট	ফেরাস অ্যামোনিয়াম সালফেট, হেক্সাহাইড্রেড	$FeSO_4(NH_4)_2SO_4$, $6H_2O$
মিউরিয়াটিক অ্যাসিড	হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড	HCl
নাইটার	পটাসিয়াম নাইট্রেট	KNO_3
অয়েল অফ ভিট্রিয়ল	গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড	H_2SO_4
প্লাস্টার অফ প্যারিস	সোদক ক্যালসিয়াম সালফেট	$2CaSO_4$, H_2O
জিপসাম	ক্যালসিয়াম সালফেট ডাইহাইড্রেট	$CaSO_4$, $2H_2O$
পটাশ	পটাসিয়াম কার্বনেট	K_2CO_3
রেড লেড	রেড অক্সাইড অফ লেড	Pb_3O_4

যৌগের সাধারণ নাম	যৌগের রাসায়নিক নাম	যৌগের আণবিক সংকেত
স্যাল অ্যামোনিয়াক	অ্যামোনিয়া ক্লোরাইড	NH_4Cl
সল্ট কেক্	সোডিয়াম সালফেট	Na_2SO_4
বালি, সিলিকা বা কুয়ার্জ	সিলিকন ডাই অক্সাইড	SiO_2
স্মেলিং সল্ট	অ্যামোনিয়াম কার্বনেট	$(NH_4)_2CO_3$
সোডা অ্যাশ	সোডিয়াম কার্বনেট	Na_2CO_3
ওয়াশিং সোডা	সোডিয়াম কার্বনেট ডেকা হাইড্রেট	$Na_2CO_3, 10H_2O$
সোডা লাইম	কস্টিক সোডা ও স্লেকড লাইম	$[NaOH + Ca(OH)_2]$
ওয়াটার গ্লাস	সোডিয়াম সিলিকেট	Na_2SiO_3
হোয়াইট ভিট্রিয়ল	জিংক সালফেট হেপ্টাহাইড্রেট	$ZuSO_4, 7H_2O$
হোয়াইট লেড	বেসিক লেড কার্বনেট	$2PbCO_3, Pb(OH)_2$

এবারে কতকগুলি খনিজ পদার্থ, তাদের রাসায়নিক নাম ও গঠনের উল্লেখ করব।

খনিজ পদার্থ	রাসায়নিক নাম	রাসায়নিক গঠন
আর্জেনটাইট	সিলভার সালফাইড	Ag_2S
বক্সাইট	সোদক অ্যালুমিনিয়ম অক্সাইড	$Al_2O_3, 2H_2O$
অ্যালুমিনা	নিরুদক অ্যালুমিনিয়ম অক্সাইড	Al_2O_3
কার্নালাইট	পটাসিয়াম ম্যাগনেসিয়াম-ক্লোরাইড, হেক্সা হাইড্রেট	$KCl, MgCl_2, 6H_2O$
চ্যালকোপাইরাইট	কিউপ্রোসো ফেরিক সালফাইড	Cu_2S, Fe_2S_3
ক্যাসিটেরাইট	টিন ডাই অক্সাইড	SnO_2
সিনাবার	মারকিউরিক সালফাইড	HgS
কপার পাইরাইটিস	কপার ফেরাস সালফাইড	CuS, FeS অথবা $CuFeS_2$
ক্রায়োলাইট	সোডিয়াম অ্যালুমিনিয়াম ফ্লোরাইড	$3NaF, AlF_3$ অথবা Na_3AlF_6
ডলোমাইট	ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট	$CaCO_3, MgCO_3$
ফ্লোরস্পার	ক্যালসিয়াম ফ্লোরাইড	CaF_2
গ্যালেনা	লেড সালফাইড	PbS
হিমাটাইট	ফেরিক অক্সাইড	Fe_2O_3 (লাল) $2Fe_2O_3, 3H_2O$ (বাদামী)
হর্ন সিলভার	সিলভার ক্লোরাইড	$AgCl$
আয়রন পাইরাইটিস	ফেরাস সালফাইড ও সালফার	$(FeS + S)$ অথবা FeS_2

খনিজ পদার্থ	রাসায়নিক নাম	রাসায়নিক গঠন
ম্যাগনেসাইট	ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট	$MgCO_3$
পাইরোলুসাইট	ম্যাঙ্গানিজ ডাই অক্সাইড	MnO_2
ফসফোরাইট	ক্যালসিয়াম ফসফেট	$Ca_3(PO_4)_2$
সাইডেরাইট	ফেরাস কার্বনেট	$FeCO_3$
সিলভাইন	পটাসিয়াম ক্লোরাইড	KCl
জিংক ব্লেণ্ড	জিংক সালফাইড	ZuS
জিংকাইট	জিংক অক্সাইড	ZuO

আণবিক সংকেতের বিস্তারিত আলোচনা শেষ হলো। এবারে গঠনমূলক সংকেত বা সংযুতি সংকেত প্রসঙ্গে আসা যাক। তৃতীয় অধ্যায়ে এ বিষয়ে একটুখানি উল্লেখ ছিল মাত্র, ছিল না বিষদ আলোচনা। এখন এ প্রসঙ্গটির একটু বিস্তারিত আলোচনা করা যাক্।

গঠনমূলক সংকেত বা সংযুতি সংকেত ঃ

যে সংকেত দ্বারা কোন অণুর গঠনে ঐ অণুর মধ্যেকার পরমাণুগুলি পরস্পরের সংগে কিভাবে যুক্ত থাকে তা দেখানো হয়, সেই সংকেতকে গঠনমূলক সংকেত বা সংযুতি সংকেত বলা হয়।

অন্যভাবে সংজ্ঞা দিতে গেলে বলতে হয় ঃ অণুর মধ্যে যে পরমাণুগুলি থাকে, তাদের যোজ্যতার পারস্পরিক প্রশমনের ফলে যে যে বন্ধন উৎপন্ন হয় সেই বন্ধনের সাহায্যে ঐ অণুর সংকেত প্রকাশ করা হ'লে, সেই সংকেতকে গঠনমূলক সংকেত বলে।

তৃতীয় অধ্যায়ে এই যোজ্যতা বণ্ড বা যোজ্যতা বন্ধনের কথা বলা হয়েছে। যৌগের সংযুতি সংকেত লিখবার সময় পরমাণুর যোজ্যতা যত, তত সংখ্যক হাইফেন (-) চিহ্ন বসাতে হয়। এই হাইফেন চিহ্নগুলি দ্বারাই যোজ্যতা বন্ধন বা যোজক প্রকাশ করা হয়। যথা—

মৌল	যোজ্যতা	যোজ্যতা প্রকাশক বণ্ড	যৌগের গঠনমূলক সংকেত	যৌগের আণবিক সংকেত
H O	1 2	H— —O—	H—O—H	H_2O
Mg Cl	2 1	—Mg— —Cl	Cl—Mg—Cl	$MgCl_2$
Al Cl	3 1	—Al— | —Cl	Cl—Al—Cl | Cl	$AlCl_3$
C H	4 1	| —C— | H—	H | H—C—H | H	CH_4
Mg O	2 2	—Mg— —O—	Mg=O	MgO

বুঝবার সুবিধের জন্যে নীচে কয়েকটি সুপরিচিত যৌগের আণবিক সংযুতি সংকেত দেওয়া হলো।

যৌগের নাম	আণবিক সংকেত	সংযুতি সংকেত
অ্যামোনিয়া	NH_3	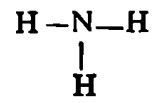
সালফিউরিক অ্যাসিড	H_2SO_4	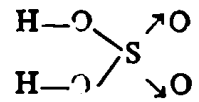
ফেরিক অক্সাইড	Fe_2O_3	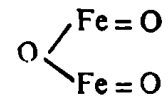
কার্বন ডাই অক্সাইড	CO_2	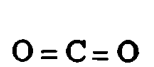
সালফার ট্রাই অক্সাইড	SO_3	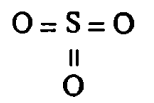
ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড	$Ca(OH)_2$	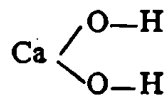
সোডিয়াম কার্বনেট	Na_2CO_3	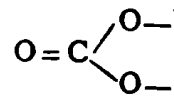
ফসফরাস পেন্টক্সাইড	P_2O_5	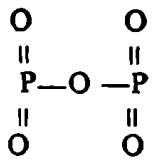
অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড	NH_4Cl	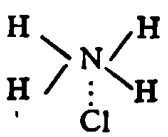
ক্যালসিয়াম কার্বাইড	CaC_2	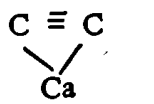

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে 'অণু গঠনে অণুর অন্তর্গত সমস্ত পরমাণুর যোজ্যতা পরিতৃপ্ত থাকবে'— এই উক্তিরও ব্যতিক্রম আছে। যেমন কার্বন মনক্সাইড অণুর (CO) অন্তর্গত কার্বন পরমাণুর দুটি যোজ্যতা অতৃপ্ত বা বিযুক্ত বা সুপ্ত থেকে যায়। এই ধরনের অণুকে তাই 'অপূর্ণ অণু' বলা হয়।

আণবিক সংকেত ও সংযুতি সংকেত ছাড়াও আর এক রকম সংকেত আছে। তার নাম 'ইলেকট্রনীয় সংকেত'।

ইলেকট্রনীয় সংকেত :

ইলেকট্রনীয় সংকেতে অণু গঠনকারী পরমাণুগুলির সংযুতি 'যোজ্যতা জ্ঞাপক ইলেকট্রনের' বা Valency electrons-এর (ডট্ ও ড্যাড়া চিহ্নের) সাহায্যে দেখানো হয়।

নীচে কতকগুলি যৌগের ইলেকট্রনীয় সংকেত উল্লেখ করা হলো।

যৌগ	গঠনমূলক সংকেত	ইলেকট্রনীয় সংকেত
জল	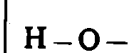	
মিথেন	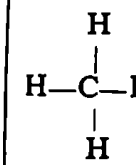	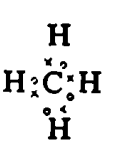
সালফিউরিক অ্যাসিড	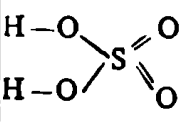	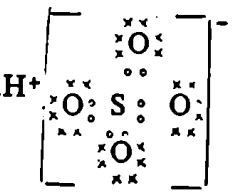
হাইড্রোজেন পার অক্সাইড	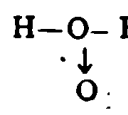	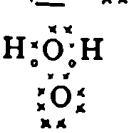
হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড	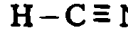	
অ্যাসিটিলিন	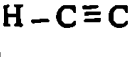	
কার্বন ডাই অক্সাইড	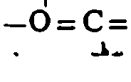	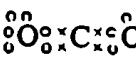
মিথাইল অ্যালকোহল	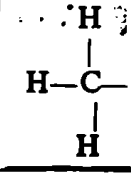	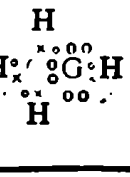

॥ প্রশ্নাবলী ॥

1. যোজ্যতার জ্ঞান কি ভাবে রসায়ন বিজ্ঞান পাঠকে সহজতর করে তা ব্যাখ্যা কর ঃ

2. নিম্নলিখিত যৌগগুলির রাসায়নিক নাম লেখ ঃ

(a) $NaClO_3$ (b) $Ca_3(PO_4)_2$ (c) $K_2Cr_2O_7$ (d) BaO_2 (e) $MgSiO_3$ (f) Mg_3N_2 (g) $BaCrO_4$ (h) Pb_3O_4 (i) $Ca(HCO_3)_2$ (j) $Sn(CO_3)_2$ (k) Na_2ZnO_2 (l) $ZnSO_4, 7H_2O$

3. নিম্নলিখিত সংকেতগুলির ভুল সংশোধন কর ঃ

(a) $CaNO_3$ (b) $CuPO_4$ (c) PbCl (d) NaI_2 (e) $AlZuO_2$ (f) KSO_4 (g) $NaCO_3$ (h) $AlNO_3$ (i) $AlCrO_4$ (j) Ag_2Cl

4. গঠনমূলক সংকেত বলতে কি বোঝ? উদাহরণ দাও।

5. 'অপূর্ণ অণু' কথার অর্থ কি? উদাহরণ দাও।

6 যোজ্যতা বন্ধন বা যোজক কাকে বলে? নিম্নলিখিত মৌলগুলিকে তাদের যোজ্যতা প্রকাশক বন্ধন চিহ্ন ব্যবহার করে লিখে দেখাও ঃ—

H ; O ; Mg ; Al ; C

7. নিম্নলিখিত যৌগগুলির আণবিক সংকেত লেখ ঃ—

(a) বেরিয়াম জিংকেট (b) ক্রোমিয়াম নাইট্রেট (c) বিসমাথ কার্বনেট (d) অ্যালুমিনিয়াম সায়ানাইড (e) ম্যাগনেসিয়াম ফসফাইট (f) কপার ফেরোসায়ানাইড (g) ম্যাগনেটাইট (h) রেড লেড (i) কার্নালাইট (j) জিপসাম (k) হোয়াইট লেড (l) জিংক ব্লেণ্ড (m) ব্লিচিং পাউডার (n) ইপসম সল্ট (o) গ্রীন ভিট্রিয়ল (p) ডলোমাইট (q) হিমাটাইট (r) ক্যাসিটেরাইট।

8. ইলেকট্রনীয় সংকেত বলতে কি বোঝ? উদাহরণ দাও।

9. নিম্নলিখিত যৌগগুলির গঠনমূলক সংকেত লেখ ঃ

(a) মিথেন (b) হাইড্রোজেন পার অক্সাইড (c) অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড (d) ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড (e) বেরিয়াম কার্বনেট (f) ক্যালসিয়াম বাই কার্বনেট (g) ফেরিক সালফেট (h) ক্রোমিয়াম নাইট্রেট (i) হাইপো-ক্লোরাস অ্যাসিড।

10. নিম্নলিখিত যৌগগুলির ইলেকট্রনীয় সংকেত লেখ ঃ

(a) জল (b) সালফিউরিক অ্যাসিড (c) ইথিলিন (d) কার্বন ডাই-অক্সাইড (e) মিথাইল অ্যালকোহল (f) অ্যাসিটিলিন (g) হাইড্রোজেন পার অক্সাইড (h) হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড।

11, নিম্নলিখিত যৌগগুলির রাসায়নিক নাম ছাড়া অন্য যে নাম প্রচলিত আছে, সেগুলি লেখ ঃ

(a) $CaSO_4, 2H_2O$ (b) $NaHCO_3$ (c) $FeSO_4, 7H_2O$ (d) Ca(OCl)Cl (e) $K_2SO_4, Al_2(SO_4)_3, 24H_2O$ (f) Pb_3O_4 (g) $CuSO_4, 5H_2O$ (h) $FeSO_4, (NH_4)_2SO_4, 6H_2O$

12. নিম্নলিখিত যৌগগুলির আণবিক সংকেত লেখ ঃ

(a) বোরাক্স (b) ক্যালোমেল (c) গ্রবার সল্ট (d) লুনার কস্টিক (e) ওয়াটার গ্লাস (f) সিলিকা (g) অয়েল অফ ভিট্রিয়ল (i) মিউরিয়াটিক অ্যাসিড (j) ড্রাই আইস (k) হাইপো (l) লিথার্জ (m) মিল্ক অফ ম্যাগনেসিয়া।

13. উপরের 12 নম্বর প্রশ্নের অন্তর্গত—

(a) কোন্ যৌগটি ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়?

(b) কোন্ যৌগটি ফটোগ্রাফির কাজে লাগে?

(c) কোন্ যৌগটি 'রাসায়নিক বাগান' তৈরী করতে দরকার হয়?

(d) কোন্ যৌগটির ওটি অজৈব লবণের ক্ষারকীয় মূলক সনাক্তকরণের কাজে লাগে?

(e) কোন্ যৌগটি হলুদ বর্ণের?

(f) c যৌগটির নাম যে বিজ্ঞানীর নামানুসারে রাখা হয়েছে, সেই বিজ্ঞানীর পুরো নামটি কি?

(g) j যৌগটির নামের আগে 'ড্রাই' কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে কেন?

(h) কোন্ যৌগটি কাচ উৎপাদন করতে প্রয়োজন হয়?

সমুদ্র-দানব অক্টোপাস

নারায়ণ চক্রবর্তী

অক্টোপাস কাকে বলে জান তো তোমরা? হ্যাঁ, ঠিক বলেছ, ওরা সামুদ্রিক প্রাণী, অর্থাৎ সমুদ্রেই থাকে। কিন্তু এটুকু জানলেই তো চলবে না, ওদের সম্পর্কে জানবার অনেক কথাই আছে, তারই কিছু কিছু আজ বলছি তোমাদের।

অক্টোপাসের বৈজ্ঞানিক নাম অক্টোপাস হিউমেলিঙ্কি (Octopus hummelincki), খুব খটোমটো নাম তাই না? কি আর করা যাবে, প্রাণীটিও যে বেজায় খটোমটো বীভৎস। প্রাণী হিসেবেও এরা এমন কিছু উন্নত শ্রেণীর নয় মোটেই, বরং বলা যায় যে বেশ নীচু স্তরের প্রাণীই। শামুক কি ঝিনুক দেখেছ নিশ্চয়ই। অক্টোপাসরা তাদেরই জাত-ভাই, জ্ঞাতি-গোষ্ঠী। বৈজ্ঞানিক শ্রেণী-বিভাগে অক্টোপাসরা হচ্ছে মোলাস্কা শ্রেণীর প্রাণী। পৃথিবীর বেশীর ভাগ মোলাস্কা জাতের প্রাণীই ক্রাস্টেশিয়ান, অর্থাৎ তাদের শরীরের ওপরের অংশ বেশ শক্ত খোলা দিয়ে ঢাকা থাকে। কিন্তু অক্টোপাসরা তার ব্যতিক্রম, মানে তাদের শরীরের কোনো অংশই শামুক বা ঝিনুকের মতো শক্ত খোলা দিয়ে ঢাকা নয়।

আর এক রকমের বৈজ্ঞানিক শ্রেণী-বিভাগে অক্টোপাসরা আবার সেফালোপড্ শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। এই শ্রেণীর প্রাণীদের মাথা থেকে পা বার হয়। অক্টোপাসের বেলাও ঠিক তাই হয়েছে, তাদের আটটি লিকলিকে লম্বা পা বিকটাকৃতি মাথা থেকেই বার হয়েছে। আটটি পা আছে বলেই এই প্রাণীটিকে আমরা অক্টোপাস বলি। "অক্টো" কথাটার মানেই তো আট, তাই নয় কি?

অক্টোপাসের এই পাগুলো বেজায় লম্বা, যেখান থেকে বেরিয়েছে সেই অংশটুকু বেজায় মোটা, তারপর তা ক্রমশঃ সরু হয়ে গেছে সাপের লেজের মতো। অনেকে আবার এদের পা না বলে বলেন শুঁড়, যেমন হাতির আছে। হাতির শুঁড়ের মতোই অক্টোপাসের শুঁড় অসংখ্য মজবুত পেশী দিয়ে গড়া, তাই শুঁড় আটটিতেই আছে অসম্ভব শক্তি। এই শুঁড়কে বিজ্ঞানীরা বলেন টেন্টাকল্স্ আবার প্রত্যেকটি শুঁড়ে আছে অসংখ্য চোষক-কোষ।

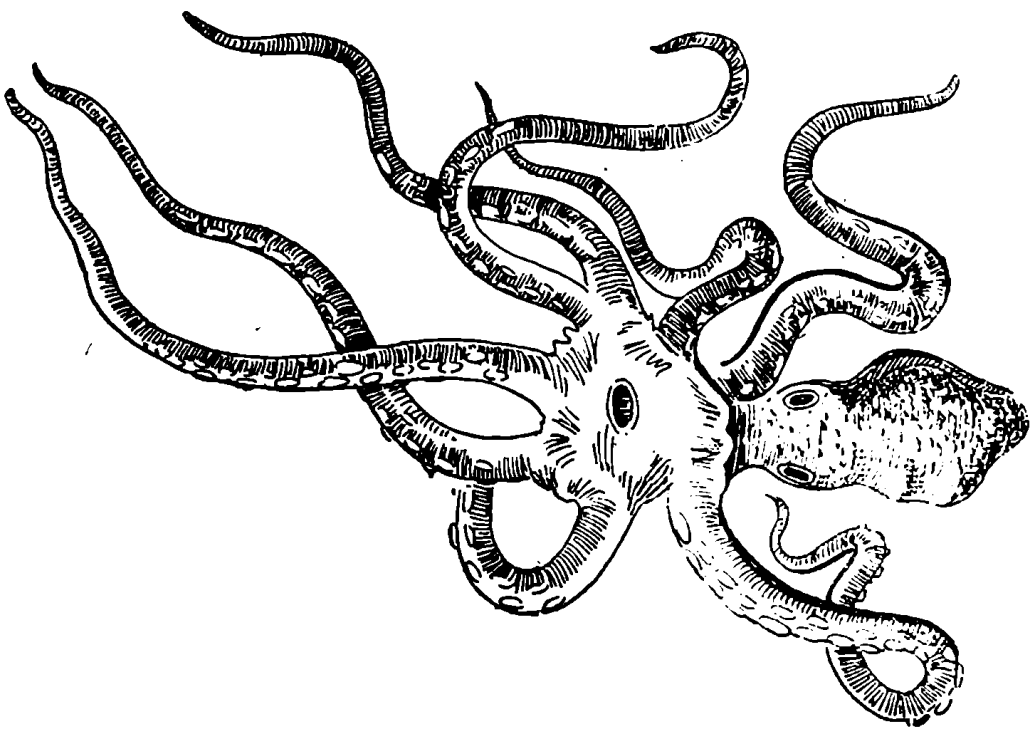

অক্টোপাসের সারা শরীরে কোথাও হাড় নেই। অদ্ভুত ব্যাপার।

অক্টোপাসরা থাকে সমুদ্রর গভীরে। ওদের বিদঘুটে-বীভৎস চেহারাটা স্বপ্নে দেখলেও ভয়ে আঁৎকে উঠবে তোমরা। সেই বীভৎস, বিদঘুটে শরীর নিয়ে অক্টোপাসরা যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন সমুদ্র-জলের গভীরে ঘুরে বেড়ায়, তখন মনে হয় ওরা যেন পাতালপুরীর দানব। কখনো কখনো ওরা সমুদ্রতলে প্রবালপুঞ্জের ফাটলে বা কোনো পাথরের ফোকরে লুকিয়ে থাকে,—লুকিয়ে লুকিয়ে চুপিচুপি কখন শিকার তার নাগালের ভেতরে আসবে তার প্রতীক্ষা করে। সাধারণতঃ অক্টোপাসরা দল বেঁধে থাকে না, একা একাই ঘুরে বেড়ায় বেশীর ভাগ সময়।

বহু প্রতীক্ষার পর কোনো শিকার যদি অক্টোপাসের শুঁতের নাগালের মধ্যে এসে পড়ে, তাহলে আর রক্ষে নেই তার, তা যে যত বড় মাছই হোক না কেন, তৎক্ষণাৎ বিদ্যুৎবেগে শুঁড় বাড়িয়ে অক্টোপাসটি তাকে পেঁচিয়ে ধরবে লিকলিকে অথচ ভীষণ-শক্তিশালী তার শুঁড় দিয়ে। ক্রমে ক্রমে অন্য শুঁড়গুলোও এগিয়ে এসে শিকারটিকে একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে নাগপাশ বন্ধনের মতো। সেই সাংঘাতিক পেষণে শিকারের ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যায়,—এমনই অসম্ভব শক্তি সেই শুঁড়গুলোতে।

এরপর কাজে নেমে যায় শুঁড় ভরতি চোষকগুলো। এই চোষকের সাহায্যেই অক্টোপাসরা শিকারের গায়ের মাংস ছিঁড়ে নিতে থাকে, তারপর রক্তপায়ী জোঁকের মতো রক্ত চুষে নেয়। চোষকের সংখ্যাও তো নেহাৎ কম নয়। প্রত্যেকটি শুঁড়েই আছে মোটামুটি ২৫০টি থেকে ৩০০টি চোষক।

অক্টোপাসরা মাংসাসী হিংস্র-প্রাণী, তাদের প্রধান খাদ্যই হচ্ছে সামুদ্রিক মাছ আর অন্য ছোট-খাটো জলচর প্রাণী, যারা সমুদ্রের গভীর তলদেশের কাছাকাছিই থাকে।

শুঁড় আটটির মাঝখানে আছে বেশ বড়-সড় একটি মাথা, তাতে আছে বড় বড় ভাঁটার মতো দুটো চোখ। মুখটা টিয়াপাখির ঠোঁটের মতো বাঁকানো। শুঁড় দিয়ে শিকারকে কাবু করে কাছে টেনে এনে এই মুখ দিয়েই কুরে কুরে তার মাংস খেয়ে নেয় অক্টোপাসেরা। রক্তপান তো আগেই হয়ে গেছে। খেয়েদেয়ে ভরা পেটে প্রবাল-পুঞ্জের ফাটলে বা কোনো পাথরের ফোকরে লুকিয়ে বিশ্রাম করে অক্টোপাসেরা। খিদে পেলে আবার শিকারের সন্ধানে বার হয়।

অক্টোপাসের আত্মরক্ষার অস্ত্রটিও বেশ মজার। ওদের শরীরের ভেতরে একটা বিশেষ ধরণের থলি আছে, এই থলিতে থাকে গাঢ় কালো রঙের একরকমের রাসায়নিক পদার্থ। এই রাসায়নিক পদার্থটিও ওদের শরীরেই তৈরী হয়, যেমন সাপের শরীরেই তৈরী হয় মারাত্মক বিষ। শরীরের ভেতরে তৈরী হয়ে ঐ রাসায়নিক পদার্থটি, যা তরল আকারেরই হয়ে থাকে,—তা ছোট ব্যাসের সংযোগকারী টিসুর ভেতর দিয়ে ঐ থলিতে এসে জমা হয়। হঠাৎ শত্রুর মুখোমুখি হলে, বা অন্য কোনো বিপদের সম্ভাবনা দেখলে অক্টোপাসরা ওদের শরীরের থলিতে জমানো গাঢ় কালো রঙের ঐ রাসায়নিক পদার্থটি পিচকারীর মতো জোরে ছিটিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে কালি-গোলা জলে অন্ধকার হয়ে যায় চারদিক, শত্রু আর দেখতেই পায় না অক্টোপাসটিকে। এই সুযোগে সেখান থেকে চম্পট দেয় অক্টোপাসটি। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে প্রকৃতি তাদের জন্য এই সুন্দর ব্যবস্থাটি করে রেখেছেন।

মানুষ তো প্রকৃতি থেকেই শিক্ষালাভ করে। তাই অক্টোপাসের কালি গোলা জলে চতুর্দিক অন্ধকার করে দেওয়ার ব্যাপারটা লক্ষ্য করেই পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলেন "স্মোক স্ক্রীন" বা কালো ধোঁয়ার পরদা। যুদ্ধের সময়ে কোনো যুদ্ধ-জাহাজকে শত্রুর আক্রমণ থেকে পালিয়ে বাঁচতে হলে সেই বেকায়দায় পড়া জাহাজটি সঙ্গে সঙ্গে 'স্মোক-স্ক্রীন' যন্ত্র ব্যবহার করে। ফলে তার চারদিকে বহুদূর পর্যন্ত ঘন-কৃষ্ণ গভীর কালো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। শত্রু পক্ষ আর তাকে দেখতেই পায় না তো কামান দাগবেই বা কী, টর্পেডো ছুঁড়বেই বা কী।

তখন সেই ঘন কালো ধোঁয়ার আড়ালে আড়ালে চুপচাপ বহু দূরে পালিয়ে যায় আক্রান্ত জাহাজটি,—ঠিক একটি অক্টোপাসেরই মতো।

এম এফ/১৮, সিমুলগ্রাম, পোস্ট ঃ—কুলটি-৭১৩৩৪৩
জেলা ঃ – বর্ধমান

বিজ্ঞান সাধক
জগদীশচন্দ্র

অখণ্ড বাংলা। আধুনা বাংলাদেশ। এই দেশে বিক্রমপুর পরগনার একটি অখ্যাত গ্রাম রাঢ়িখাল। সকাল বেলায় গ্রামের পথ দিয়ে উদভ্রান্তের মত হেঁটে চলেছে একটি লোক—

দিলীপ দাস

ভাই, আমাকে একটু সাহেবের কাছে পৌঁছে দেবে? বলবে, জেল থেকে মাধব ডাকাত এসেছে।
আচ্ছা, চল।
কিছুদূর গিয়েই
ওকি নাম বললে? মাধব-মাধব— অাঁ!
—ওরে বাবা রে ডাকাত! ডাকাত! মাধব ডাকাত এসেছে—
কি-কি হয়েছে, শ্যাম? অমন করছিস কেন?
ডাকাত! মাধব ডাকাত এসেছে!
আমারে চিনতে পারেন কত্তা?
হুম, আমার সব কিছু তো তোমার দলের লোকেরাই শেষ করেছে, এবার বাকিটুকু তুমি শেষ করতে এসেছ?
না কত্তা, আমি এসেছি ভালভাবে বাঁচতে। কিন্তু কিন্তু ডাকাত বলে কেউ আমারে কাজ দেয় না
ডাকাতি ছেড়ে দেবে?
বেশ, তুমি আমার কাছে কাজ কর। আজ থেকে আমার ছেলে জগদীশের দেখাশোনার ভার তোমার ওপর ছেড়ে দিলাম
2

আবিষ্কারের গল্প

লাই ডিটেকটর

সুনীল সরকার

ছোটবেলায় আমরা জানতাম, মিথ্যে কথা বলা পাপ। আর পাপ করলে নরকেও স্থান হবে না। নরক! সে তো ভয়ংকর শাস্তির জায়গা। পাপের তারতম্য ও গুরুত্ব অনুসারে যমরাজ বিচার করতেন এবং সাজা দিতেন। ভয়ংকর সেই সব শাস্তির মর্মান্তিক ব্যবস্থার কথা শুনে আমরা আঁতকে উঠতাম। ভাবতাম, না বাবা, কখখনো কোন পাপকার্য করবো না, বলবো না কোন মিথ্যে কথা।

বাবা, মা, ঠাকুমা, দিদিমা ও দাদুভাইদের কাছে এমনি অনেক পাপ-পুণ্যের গল্প আমরা শুনেছি। মিথ্যে কথা বলা যেমনি পাপ, তেমনি চুরি করা আরো পাপ। আর বড়দের সম্মান না করা, শিক্ষকদের যে কোন জায়গায় দেখে তাঁকে প্রণাম না করা মস্তবড় অপরাধ। আর এই সব অপরাধের শাস্তি তখনকার দিনে শুধু বাড়ীতেই হতো না - নরকেও হতো।

সত্যি এসব শোনার পর আমাদের সেই রকম একটা মানসিকতাই তৈরি হয়েছিলো। মিথ্যে-টিথ্যে বড় একটা বলতাম না, বড়দের কথানুযায়ী সত্যিটাই বলতাম। তবে আম-জামের লোভে কখনো সখনো এঁর ওঁর বাড়ী চড়াও হতাম এবং গাছে চড়ে লুকিয়ে লুকিয়ে আম জাম নারকেল, লেবু-লিচু প্রভৃতি ফলটল পেরে খেতাম। অবশ্য সে-সব অপরাধের বিচার নরকে যাবার আগে বাড়ীতেই হয়ে যেতো। আর সেই বিচারের আঘাতে জর্জরিত স্থানে সান্ত্বনার প্রলেপ দিতে দিতে ঠাকুমা, দাদু আমাদের ওই সব আদর্শ বা নীতি কথা শোনাতেন। মিথ্যে কথা বলো না, না বলে পরের গাছে চড়ো না—চুরি করো না। এগুলি কিন্তু নরক সম্পাদক নোট করে রাখছেন, তোমার মৃত্যুর পর সেই অনুযায়ী নরকে তোমার বিচার হবে। ওই সব নীতিকথা আদর্শকথা, নানা দেশের রূপকথা, রামায়ণ-মহাভারত ও পাপপুণ্যের কথা শুনে শুনে শৈশবের অপরাধপ্রবণ মনটা সত্যি দমিত হয়ে যেতো। নানা ভয়-ভীতির মধ্য দিয়ে চলতে হতো। সন্ধান করতে হতো বড়দের।

সেই শিক্ষা-দীক্ষা এখন আর নেই। নেই পাপ-পুণ্যের কোন ভেদাভেদ, নেই নরকের বিচার। নেই নিয়ম নীতি, আদর্শ ও নীতি। সমাজের অবক্ষয়ে এখন ছোট বড় সকলেই কলুষিত ও বিপথগামী। সত্যি কেউ বড় একটা বলে না—হোক সে ছোট হোক্ বড়। যেনো মিথ্যের দাবানলে দাউ দাউ করে জ্বলছে আমাদের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা। মিথ্যে কথা বলা এখন আর পাপ নয়। মিথ্যেটাই এখন পুণ্যি। আর যারা অপরাধী বা অপরাধ-প্রবণ মন যাদের—তারা তো সত্যি বড় একটা বলে না। তাদের কোন্‌টা যে সত্যি কথা আর কোন্‌টা যে মিথ্যে তা বিশেষজ্ঞরাও ধরতে পারেন না।

এই প্রসঙ্গে একটা গল্প বলছি শোন। একবার আমাদের পাড়ায় একটা চোর ধরা হলো। বয়স তার বেশি নয়—ষোল কিংবা সতেরো। তাকে জিজ্ঞেস করতেই সে বললো ঃ বাবু আমি স্টেশনে থাকি। রাত্রে ভীষণ শীত করে তাই একটা জামা অথবা গেঞ্জির জন্যে এসেছিলাম। আমি চোর নই; বিশ্বাস করুন বাবু, বিশ্বাস করুন। দু'চার জন দু'এক ঘা লাগাবার পরও ছেলেটি বার বার ওই কথাই বলতে লাগলো। তখন বাধ্য হয়ে আমি বললাম, ওইটুকুন ছেলে, নিশ্চয়ই মিথ্যে কথা বলছে না। বলে ওকে একটা জামা দিয়ে ছেড়ে দিলাম। অনেকেই আমাকে বললেন, আপনি ভুল করলেন। ওই ছেলেটা আলবত্ চোর। চুরি করতেই এসেছিলো।

পরবর্তীকালে আমার ধারণাই মিথ্যে হয়েছিলো। সেও এক আশ্চর্য ঘটনা। আমাদের প্রতিবেশী রামু একদিন রাত্রে তিনটি ছেলেকে ধরে আমাদের কাছে নিয়ে এলো। আমি অবাক হয়ে দেখলাম যাকে সহানুভূতি দেখিয়ে আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম, সেই ছেলেটিও রয়েছে। রামু বললে ঃ 'কাকু, এরা চুরি করতে এসেছিলো এবং পকেটে একগোছা চাবি নিয়ে। বলে ওদের একজনের পকেটে হাত দিয়ে রামু একগোছা চাবি বার করলো। রাগে দুঃখে আমি খুব হতাশ হয়ে পড়লাম এবং ভীষণ রেগে গিয়ে সেই ছেলেটিকে একটি চড় মারলাম। ছেলেটি ছিটকে এসে আমার পায়ে পড়লো। 'বাবু, আপনি আমাকে বাঁচান, আমি কখখনো চুরি করবো না। পেটের দায়ে বাবু, বাড়ীতে ছোট ছোট ভাই বোন।'—সহ্য করতে পারলাম না। কানে আঙুল চাপা দিয়ে পালিয়ে এলাম। তারপরের ঘটনা তোমরা বুঝতে পারছে। প্রচণ্ড মেরে ওদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিলো।

কাঁচা চোর বলেই পাকা কথা বেশীক্ষণ বলতে পারে

নি। স্বীকার করতেই হয়েছিলো। কিন্তু পৃথিবীতে এমন সব স্বভাব চোর, খুনী ও অপরাধপ্রবণ মানুষ আছে যাদের কাছ থেকে প্রকৃত সত্য জানতে বা বার করতে পুলিশ, গোয়েন্দা অফিসার কেন মনস্তত্ত্ববিদ্‌রাও হিমসিম খেয়ে যান। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত জিজ্ঞাসাবাদ করেও তেমন কিছু বার করতে পারেন না। এমন কি, শারীরিক নির্যাতন করেও না। অথচ সাধারণ নিরীহ নিরপরাধ মানুষের মধ্যে মিশে এরা হরেক রকম অপরাধ করে যাচ্ছে। ফলে কিছু নিরীহ-নিরপরাধ লোক ধরা পড়ছে এবং পুলিশের জেরার কাছে তারা আবোল-তাবোল বলছে—এমনকি, শারীরিক নির্যাতন পেয়ে বা নির্যাতনের ভয়ে তাঁরা দোষ না করেও দোষ স্বীকার করছে। শুধু তাই নয়, এভাবে বহু নিরপরাধ ব্যক্তি সাজা পেয়ে কারাবাস করছেন, এমন ঘটনা আমাদের দেশে বিরল নয়—আকছার ঘটছে।

কিন্তু প্রকৃত অপরাধীকে খুঁজে বার করা, ধরা এবং শাস্তি দেওয়া যেমন কঠিন হচ্ছে, তেমনি স্বীকারোক্তি আদায় করাও সম্ভব হচ্ছে না। ফলে প্রকৃত অপরাধীদের সাধারণ মানুষ থেকে আলাদা করা যাচ্ছে না—এমনকি, ধরা পড়ার পরও প্রত্যক্ষ সাক্ষী-সাবুদ ও স্বীকারোক্তির অভাবে তারা ছাড়া পেয়ে পুনরায় অপরাধের পর অপরাধ করে সমাজে ত্রাসের সৃষ্টি করছে।

এ হেনো স্বভাব-চোর, ছিনতাই, পকেটমার, ডাকাত, খুনী, স্মাগলার প্রভৃতি দাগী অপরাধী, ব্যক্তিদের সাধারণ মানুষ থেকে আলাদা করে চিহ্নিত করার জন্যে এবং চিহ্নিত করার পর যাতে তারা অপরাধ অনুযায়ী সাজা বা শাস্তি পায় তার জন্য বিজ্ঞানীরা নিরন্তর গবেষণা করে প্রকৃত অপরাধী নির্ণায়ক বহু পদ্ধতির উদ্ভাবন ও আবিষ্কার করেছেন।

পরিচিত কিছু কিছু পদ্ধতির কথা আমরা জানি, যেমনঃ পায়ের ছাপ, আঙুলের ছাপ বা টিপ সহি গ্রহণ, অকুস্থলের রক্ত, থুথু, মাথার চুল পরীক্ষা করেও অপরাধের ধরন এবং অপরাধী সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করা যায়। এছাড়া কুকুরের সাহায্যে অপরাধী নির্ণয় এটা তো তোমরা জানো। আমাদের দেশে খুনের কিনারা করতে এবং খুনীকে ধরতে কুকুরের সুতীব্র ঘ্রাণশক্তির এই ব্যবস্থা প্রায়শঃই ব্যবহার করা হয়। এছাড়া ফটোগ্রাফী, অবয়ব তৈরি ও অকুস্থলের নিক্ষিপ্ত বস্তুর পরীক্ষণের মাধ্যমেও অপরাধ ও অপরাধী সম্পর্কে ধারণা করা যায়। শুধু তাই নয়, ফরেনসিক ল্যাবরেটারীতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে অপরাধের ধরন ও অপরাধী সম্পর্কে নিয়মিত গবেষণা চলছে। পোস্টমর্টম বা ডাক্তারী পরীক্ষা থেকে জানা যাচ্ছে, আঘাতপ্রাপ্ত বা মৃতব্যক্তির প্রকৃত আঘাত বা মৃত্যুর কারণ।

উপরিউক্ত এই সব তথ্য অনুসন্ধান করার পর, প্রকৃত অপরাধীর খোঁজ পাওয়া যায় এবং তখন তাকে পাকড়াও করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এই জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় অপরাধী সত্যি কথা বলছে, না মিথ্যে কথা বলছে এটা জানার জন্যে অপরাধ বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন 'লাই ডিটেকটর' (Lie Ditector) নামক একটি যন্ত্র।

আজকাল পৃথিবীর যে কোন দেশে অপরাধ ও অপরাধী তদন্তের কাজে পুলিশ বা গোয়েন্দা বিভাগে 'লাই-ডিটেকটর' নামক এই যন্ত্রটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তোমরা শুনলে আনন্দ পাবে যে, এই যন্ত্রটি অপরাধীর সত্য ও মিথ্যা ভাষণের উপর দৃষ্টি রাখছে আমাদের দেশেও।

এই 'লাই-ডিটেকটর' যন্ত্রটি ছোট একটি সুটকেসের মধ্যে থাকে। একজন শিক্ষণপ্রাপ্ত কোন গোয়েন্দা বা পুলিশ অফিসার এই যন্ত্রটি পরিচালনা করেন। জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় সন্দেহভাজন অপরাধী ইচ্ছাকৃতভাবে কোন সত্য গোপন করছে কিনা—তা এই যন্ত্রের মধ্য দিয়ে বোঝা যায়। জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় শিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিটি যন্ত্রটিকে চালু করে তার উপর প্রখর দৃষ্টি রাখেন এবং সন্দেহভাজন অপরাধী যদি কাল্পনিকভাবে মিথ্যে ভাষণের দ্বারা অপরাধের গুরুত্ব স্বীকার না করে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার চেষ্টা করে তাহলে যন্ত্র পরিচালক যন্ত্রের মধ্য দিয়ে তা বুঝতে পারেন। ঐ সময় সন্দেহভাজন ব্যক্তির রক্তের চাপ, নাড়ীর গতি, শ্বাস-প্রশ্বাসের ধরন এবং সামান্য শারীর-বিদ্যুৎ-প্রবাহের ফলে তার গোটা শরীরের প্রতিক্রিয়া যন্ত্রী সূক্ষ্মভাবে অনুধাবন করতে পারেন। শুধু তাই নয়—এই যন্ত্রের সাহায্যে যন্ত্রী যে কোন মানুষের মানসিক বা অনুভূতির তারতম্য লক্ষ্য করতে পারেন—এবং বুঝতে পারেন সজ্ঞানে সে কোন সত্য গোপন করে যাচ্ছে কিনা, না কোন কল্পকথার আশ্রয় নিয়ে সকলকে বোকা বানাবার চেষ্টা করছে। এই সব তারতম্য বা অপরাধীর মানসিক অস্থিরতা, সত্য গোপন করার চেষ্টা এবং তজ্জনিত অস্বাভাবিক মানসিক বৈলক্ষণ্য থেকেই প্রকৃত অপরাধী নির্ণয় করতে 'লাই-ডিটেকটর' যন্ত্রীকে নিখুঁত ও সঠিকভাবে সাহায্য করছে।

বি পি. সি. জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুল
পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলা—নদীয়া।

জীবনবিজ্ঞানের প্রথম পাঠ

তারকমোহন দাস

বিজ্ঞানশাস্ত্রেরই একটি শাখা জীবনবিজ্ঞান। এই জীবনবিজ্ঞান সম্পর্কে কিছু বলবার আগে বিজ্ঞানের মূল কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা দরকার, যেমন—বিজ্ঞান বলতে কি বোঝায়?—বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলতে আমরা ঠিক কি বুঝি, ইত্যাদি। বিজ্ঞান শব্দটির অর্থ যদি অভিধানে খুঁজে দেখ তাহলে দেখবে সেখানে লেখা আছে, বিজ্ঞান=বিশেষ জ্ঞান। বিজ্ঞান শব্দটির ব্যাখ্যা অনেক ভাবে করা হয়. সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, বিজ্ঞান হল—পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন, কল্পিত ধারণা, পরীক্ষা, প্রমাণ ও যুক্তি ইত্যাদির দ্বারা নির্ণীত শৃঙ্খলাবদ্ধ জ্ঞান।

এখানে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন, কল্পিত ধারণা, পরীক্ষা, প্রমাণ ইত্যাদি অনেকগুলি শব্দ পর পর ব্যবহার করা হয়েছে, এগুলির অর্থ কি?—বাস্তবিক পক্ষে এগুলি নিয়েই তৈরী হয়েছে বিজ্ঞানের মূল কাঠামোটি এবং এই পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন, কল্পিত ধারণা ও পরীক্ষার মাধ্যমে ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়াকে বলা হয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। বিজ্ঞানের সকল শাখা সম্পর্কেই একথা খাটে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন বিষয় চর্চা করা হয়, কিন্তু কোন সত্য আবিষ্কারের মূল পদ্ধতিটি সকল শাখায় একই, এখানে কি পদার্থবিজ্ঞান, কি ভূ-বিজ্ঞান, কি জীবনবিজ্ঞান সকলের মধ্যেই এক আশ্চর্য মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তাই বিজ্ঞান চর্চা করতে হলে এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির কথা প্রথমেই আমাদের ভাল করে জানা দরকার। আর এটা ঠিকমত বুঝতে পারলে আমরা ধরতে পারব কোন্‌টা বিজ্ঞান, আর কোন্‌টা বিজ্ঞান নয়। কোন্‌টা পরীক্ষা, প্রমাণ ও যুক্তিগ্রাহ্য সত্য আর কোন্‌টা শুধু অলীক কল্পনা, ও অন্ধ বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আমাদের সমাজে আজ বহু জিনিস নির্বিচারে বিজ্ঞানের নামে চলে আসছে যা আদৌ বিজ্ঞান নয়, যেমন—ভাগ্য গণনা, রাশিফল, হস্তরেখা বিচার, গ্রহশান্তি, ঝাড়ফুঁক, তুকতাক্ কবচ মাদুলী ইত্যাদি। আমরা নিজেরা বিজ্ঞানের ছাত্র, অথচ মনে মনে বহু রকম অন্ধ বিশ্বাস কুসংস্কার, গোড়ামী পুষে চলেছি এবং সেইমত কাজ করছি। তাতে কি হচ্ছে? তাতে নিজেকে এবং সমাজকে বিজ্ঞানের কল্যাণময় প্রভাব থেকে বঞ্চিত করছি, তার গতিশীলতাকে ব্যাহত করছি। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গী বলতে যা বোঝায় তা বিজ্ঞান চর্চার প্রথম ধাপ থেকেই আয়ত্ত করতে হবে, নইলে বিজ্ঞান নিয়ে পড়া-শোনার কোন অর্থ হয় না।

সঠিক ভাবে পর্যবেক্ষণ করা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রথম ধাপ। আমরা সকলেই সবকিছু দেখি, কিন্তু দেখার মত করে দেখতে আমাদের মধ্যে খুব কম লোকেই জানে। আমাদের চারপাশে নানা রকম জীবজন্তু, গাছপালা রয়েছে, সারাজীবন ধরে দেখলেও আমাদের মধ্যে অনেকেরই তাদের সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণা তৈরী হয় না, কেননা কোনদিনই তাদের খুঁটিয়ে দেখিনি। রাস্তার মোড়ে যে কৃষ্ণচূড়া গাছটি বহু বছর ধরে দেখছি তার ফুলের কয়টি পাপড়ি? ফল কি রকম দেখতে? ফুলের গন্ধ আছে কি না?—এসব কথা জিজ্ঞাসা করলে আমাদের অনেককেই নিরুত্তর থাকতে হয়। আমরা চোখ, নাক, কান, জিব ও ত্বক—এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সহজাত ক্ষমতার সাহায্যে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করে থাকি। দৈনন্দিন জীবনে এই ক্ষমতার সাহায্যেই আমরা সিদ্ধান্ত নিই—কোনো বস্তুটি বড় না ছোট, মিষ্ট না তিক্ত, কোমল না কঠিন, ভাল না মন্দ ইত্যাদি। এই পর্যবেক্ষণ করবার ক্ষমতা সকলের সমান নয়, কিন্তু চেষ্টা করলে বিদ্যাবুদ্ধির মত এই পর্যবেক্ষণ করবার ক্ষমতা অনেক বাড়ান যায়। সাধারণ মানুষের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা সম্পর্কে যদি পরীক্ষা নেওয়া হয় তাহলে দেখা যাবে কেউই ফুল মার্ক পাবে না। নামকরা কোনো বড় বৈজ্ঞানিক হলে বড় জোর একশ'র মধ্যে ৮০-৮৫ নম্বর পেলেও পেতে পারেন, তার বেশী কিছুতেই নয়। তোমার আমার মত একজন অনভিজ্ঞ মানুষের পক্ষে এই বিষয়ে একশ'র মধ্যে ২৫-৩০-এর বেশী নম্বর পাওয়া সম্ভব নয়। তাহলে কি আমরা ঠিক দেখতে পাই না? দেখতে পাই না ঠিক নয়, আমরা দেখতে শিখি নি। কিভাবে একটি বস্তু বা বিষয় সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হয় সেটাই জানি না। আমাদের নানা রকম পূর্ব প্রচলিত ধারণা, অন্ধবিশ্বাস, গোঁড়ামী আমাদের পর্যবেক্ষণ শক্তিকে খর্ব করে রাখে। আমরা যা দেখতে মনে মনে ইচ্ছে করি তাই দেখি, অর্থাৎ যা দেখা দরকার মনে করি

তাই দেখি, তার বেশী কিছু দেখি না। যেমন—আমরা প্রতিদিন নানা রকম ফুল দেখছি, কিন্তু কোন্ ফুলের কটা পাঁপড়ি আছে দেখি না, কেননা সেটা দেখা দরকার বলে মনে করি না, তাই দেখি না।

সঠিক অনুশীলনের সাহায্যে এই পর্যবেক্ষণ শক্তি ক্রমশঃ বাড়ান যায়। দূর থেকে দেখে কোন বস্তু কতটা লম্বা, কতটা চওড়া, কতটা দূরে আছে, বার বার অনুশীলন করলে সেটা বলা যায়। তেমনি হাতে তুলে কোন জিনিসের সঠিক ওজন বলে দেওয়া, নানা রকম রং চেনার দক্ষতা অর্জন করা, পাখির ডাক শুনে তার নাম বলে দেওয়া, তাছাড়া প্রকৃতির মধ্যে নানা রকম গাছপালা, জীবজন্তু ও জড়পদার্থের গঠনবৈশিষ্ট্য কি ভাবে লক্ষ্য করতে হয়, তাদের হাব-ভাব, আচার-ব্যবহার কি ভাবে জানতে হয় তা সবই চেষ্টা করে এবং অনুশীলনের সাহায্যে আমাদের আয়ত্ত করতে হয়। ষষ্ঠ শ্রেণীর জীবনবিজ্ঞানের পাঠক্রমে এই বিষয়ে কতকগুলি অনুশীলনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিজ্ঞান চর্চার প্রথম ধাপই হল তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তির অধিকারী হওয়া। অত্যন্ত সতর্ক ও তীক্ষ্ণ ভাবে প্রকৃতির মধ্যে কোথায় কি বৈশিষ্ট্য বা কি ব্যতিক্রম ঘটছে সেই বিষয়ে খুঁটিয়ে দেখা, তার সঙ্গে জড়িত পরিবেশের সকল কিছু বিষয় পর্যবেক্ষণ করা। যার ফলে কোনো বস্তু বা কোনো বিষয় সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা মনের মধ্যে সৃষ্টি হয়।

২৪/এ সারকুলার গার্ডেন রিচ রোড
কলিকাতা-৭০০০২৩

প্যাডেল ঘুরিয়ে আকাশে

মতি মুখোপাধ্যায়

হাফ্ প্যাডেল কি ফুল প্যাডেল করে সাইকেল চালাতে তোমরা প্রায় সকলেই জানো। কিন্তু সে তো মাঠ বা কাঁচা-পাকা রাস্তার ওপর দিয়ে যাওয়া। যদি বলি প্যাডেল ঘুরিয়ে শূন্যে ওঠা যায় এবং ব্রায়ান অ্যালেন নামে এক ভদ্রলোক মাত্র কয়েক বছর আগে এমনি এক অদ্ভুত সাইকেল চড়ে ইংলিশ চ্যানেল পার হয়েছিলেন! বিশ্বাস হচ্ছে না তো? না হবারই কথা।

এবার খুলে বলা যাক। ভদ্রলোক যে গাড়িতে চড়ে শূন্যে উড়েছিলেন, তার প্যাডেল থাকলেও সেটি কিন্তু আদৌ সাইকেল নয়। এরোপ্লেনের মত ডানা থাকলেও এরোপ্লেন বলা যায় না। 'বকচ্ছপ' আর কি! বক নয়, আবার কচ্ছপ-ও নয়।

পোষাকি একটা নাম অবশ্যই আছে। 'গস্যামার অ্যালব্যাট্রস।' অ্যালব্যাট্রস নামে সিন্ধু-সারস। আর 'গস্যামার' শব্দের অর্থ হল মাকড়সার জালের মত পাতলা ও হালকা কোন জিনিস। তাহলে মানেটা দাঁড়াল, 'ভীষণ হালকা সিন্ধু সারস'।

বিজ্ঞানীরা এই আকাশযানটিকে বেশ কয়েক ধাপ আধুনিক করে নিয়েছেন। এখন আর সাইকেলের মত প্যাডেল ঘোরাতে হয় না, দরকার নেই ব্যাটারির বা জ্বালানির। এর চালক হল সৌর-শক্তি। নতুন মডেলের নাম ঃ 'গস্যামার পেঙ্গুইন।'

প্রকৃত রহস্য হল, আকাশ-যানটির ভিতরে আছে ফোটোভোল্টেয়িক সেল', যার কাজ সূর্যের আলোকে বিদ্যুৎ-শক্তিতে রূপান্তরিত করা। সেই বিদ্যুৎ-শক্তি একটা হোট্ট মোটরকে চালিয়ে যানটি সচল রাখে।

'পেঙ্গুইন' মাটি থেকে তিন মিটারেরও কিছু বেশী উঠে ঘণ্টায় ২৫ কিলোমিটার বেগে উড়তে পারে। প্রায় সাইকেলের গতি আর কি। দু-দিকের ডানা একত্র করলে প্রায় ২৪ মিটার লম্বা হয়। ওজন ২৫ কেজি।

মজার ব্যাপার হল আকাশ মেঘে ঢেকে গেলে বা সূর্যিঠাকুর টুপ করে মেঘের আড়ালে চলে গেলে 'পেঙ্গুইন' বেচারা আর উড়তে পারে না। আস্তে আস্তে নেমে আসে। আসলে সূর্যের আলো, তাপ সরাসরি না পেলে ফোটো সেল কাজ করে না।

এর আবিষ্কর্তা ম্যাক্ ক্রিভী ও তাঁর সহকর্মীরা। এরপর যা ভাবছেন, তা আরো অভিনব। আকাশযান তখন তিন হাজার মিটারের চেয়েও ওপরে উঠে ঘণ্টায় ৬০ কিলোমিটার বেগে উড়তে পারবে। অবশ্য তার জন্যে ৩০,০০০ 'সেল' লাগবে প্রতিটি যানে।

কিন্তু দেড়শো কিলোমিটার পর্যন্ত একটানা যেতে পারে। আরো দূরে যেতে হলে 'যান'টিকে বিশ্রাম দিতে হবে।

উৎপাদক নির্ণয়ের সহজ পদ্ধতি

নন্দলাল মাইতি

সপ্তম শ্রেণী থেকেই তোমাদের বীজগণিতে উৎপাদক নির্ণয় করতে হয়। এই শ্রেণীর পাঠ্য-সূচীতে মোট চারটি নিয়ম বা সূত্র ব্যবহার করে উৎপাদক বিশ্লেষণ করতে হয়। সেই নিয়ম বা সূত্রগুলি হলো $(a+b)^2$, $(a-b)^2$, a^2-b^2 এবং বিচ্ছেদ নিয়ম-এর প্রয়োগ। সপ্তম শ্রেণীতে আর অন্য কোন নিয়ম ও পদ্ধতির সাহায্যে উৎপাদক বিশ্লেষণ করতে হয় না। আপাত খুব সহজ মনে হলেও তোমাদের কাছে উপরের নিয়মগুলির যথাযথ প্রয়োগ সহজসাধ্য নয়। তার একমাত্র কারণ এই শ্রেণী থেকে বীজগণিতের প্রথম পাঠ শুরু হয় এবং পাটী-গণিতের যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগের যে ধারণার সঙ্গে আমরা অনেকদিন ধরে অভ্যস্থ, তা সহজে ছাড়তে পারি না। বস্তুত বীজগণিতের প্রাথমিক নিয়মগুলি অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। তা ছাড়াও এখানে ঋণাত্মক নামে এক প্রকার নতুন সংখ্যার আবির্ভাব হয়। তোমরা সবাই বেশ ভালভাবেই জান এই ঋণাত্মক সংখ্যা ভীষণ অঘটন ঘটায়। যা হোক, তোমরা অনেকেই $(a+b)^2$, $(a-b)^2$ এবং a^2-b^2 সূত্র তিনটির প্রয়োগ অভ্যাস করলে সহজে আয়ত্ত করতে পারবে। কিন্তু তোমাদের অনেকেই বিচ্ছেদ নিয়মটি ভালভাবে শিখতে চাও না। অথচ উৎপাদক বিশ্লেষণে এই নিয়মটির সর্বত্র প্রয়োগ হয়। সত্যি কথা বলতে কি, গাণিতিক ধারণার দিক থেকে বিচার করলে এই শ্রেণীর উৎপাদক বিশ্লেষণে তেমন জটিলতা নাই।

কিন্তু অষ্টম শ্রেণীতে যে-সব উৎপাদক বিশ্লেষণ করতে হয়, তার মধ্যে জটিলতা আছে। যেমন, "দ্বিঘাত রাশিমালার মধ্যপদ-বিশ্লেষণ পূর্বক উৎপাদক নির্ণয়" অধ্যায়ে কত রকমের অঙ্কই না কষতে হয়। সব অঙ্কই এক জাতীয় বটে, কিন্তু সবার প্রয়োগ-পদ্ধতি এক নয়। অর্থাৎ একটিমাত্র নিয়ম দিয়ে সব অঙ্ক কষা যায় না। সহজভাবে শুরু হয়, কিন্তু ক্রমশ জটিল, কঠিন ও দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। তখন হয়তো দেখা যায়, তোমাদের অনেকেই মাঝপথে হাল ছেড়ে দিয়েছ। না,—তোমাদের দোষ নাই, আর অঙ্কেরও দোষ নাই: দোষ হচ্ছে পদ্ধতির। কোথায় কোন নিয়ম বা পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে তা যদি সবাই বুঝতে পারতে, তা হলে নিশ্চয় তোমরা হাল ছেড়ে না দিয়ে বিপদের মাঝে অ্যাডভেঞ্চার ও রোমান্স পাবার আনন্দে মশগুল হতে। আর একটি কারণের উল্লেখ করি। তা হচ্ছে কোন কোন অঙ্ক কষতে গেলে যেন অনাবশ্যকভাবে দীর্ঘ হয়ে পড়ে। বড় খাতার পৃষ্ঠাব্যাপী প্লাস-মাইনসের তা-থৈ নাচন চললে কার আর হৃদকম্প না হয় বল!

না, কোন উপায় নাই,—ভাল না লাগলেও তোমাদের এসব নির্জীব অঙ্ক কষতে হয়। আর না পারলে অঙ্কের স্যারের বকুনি খেতে হয় "এত সহজ অঙ্ক পারনি।" তোমাদের চুপিচুপি বলি: আমি এখানে এমন একটি পদ্ধতির কথা বলব যা কোন অঙ্ক বই-এ নাই। এটি খুব সহজ, আর এই নিয়মে অঙ্ক কষলে তা মোটেই বড় হয় না। এমন কি কোন কোন অঙ্ক মুখে মুখে কষে ফেলতে পারবে। এই পদ্ধতির অনেক সুবিধা আছে। পরে তার কথা বলব।

হ্যাঁ,—নতুন পদ্ধতিটি বলার আগে প্রচলিত পদ্ধতিটি একবার দেখে নাও। তা হলে উভয় পদ্ধতির তুলনামূলক বিচার করতে পারবে।

মনে কর, $x^2+17x+30$— এই রাশিটিকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে হবে। আমি তোমাদের অনেককে খুব ভালভাবে জানি। তাই বলব এই অঙ্কটি তোমরা সবাই পারবে। তোমরা যেভাবে অঙ্কটি কষবে, তা নিম্নরূপ নয় কি?

$$\begin{aligned} & x^2+17x+30 \\ &= x^2+2x+15x+30 \\ &= x(x+2)+15(x+2) \\ &= (x+2)(x+15) \end{aligned}$$

এখন, যদি প্রশ্ন করি: তোমরা এই অঙ্কটি কষতে কি পদ্ধতি ব্যবহার করলে? তোমরা নিশ্চয়ই উত্তর দেবে: এমন দুটি সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে যাদের সমষ্টি = 17, এবং গুণফল = 30। যে যে সংখ্যাদ্বয়ের গুণফল 30, তারা হলো (a)। ও 30, (b) 2 ও 15, (c) 3 ও 10 এবং (d) 5 ও 6। এবার দেখতে

হবে এই চারজোড়া সংখ্যার মধ্যে কোন সংখ্যা দুটির সমষ্টি = 17। স্পষ্টত এখানে 2 + 15 = 17। তারপর তোমরা উপরের মত করে অঙ্কটি কষে ফেলবে। এই পদ্ধতি হচ্ছে **প্রচলিত পদ্ধতি**, স্কুলে এই পদ্ধতিই ব্যবহৃত হয়।

এবার **নতুন পদ্ধতি**-র কথা বলা যাক। এই পদ্ধতিতে একটিমাত্র পদ বিবেচ্য,—অন্য কোন পদের কথা ভাবা হয় না। সেই পদটি হচ্ছে **মধ্যপদের সহগ**। এখানে মধ্যপদের সহগটিকে বিশ্লিষ্ট করা হয় অর্থাৎ দুটি অংশে বিভক্ত করা হয়। অবশ্য যেমন-তেমন করে দুই অংশে ভাগ করলে চলবে না। কি নিয়ম বা শর্ত মানতে হবে? নিয়মটি হচ্ছে: মধ্যপদের সহগকে এমন দুটি অংশে ভাগ করতে হবে যে, প্রদত্ত রাশিমালার প্রথম-পদের সহগের সহিত বিশ্লিষ্ট প্রথম অংশের অনুপাত দ্বিতীয় অংশের সহিত রাশিমালার শেষ পদের সহগের অনুপাত সমান হয়।

এখন, এই বিবৃতিটিকে গণিতের ভাষা দেওয়া যাক। মনে কর, a = রাশিমালার প্রথমপদের সহগ, এবং b শেষপদের সহগ। এখন রাশিরমালার মধ্যপদের সহগকে যদি m ও n এই দু-অংশে ভাগ করা যায় যে বিবৃতির শর্ত পূরণ হবে, তা হলে আমরা বলতে পারি,

$$a : m = n : b \text{ বা } a : n = m : b।$$

অঙ্ক কষার পদ্ধতি বা কৌশল এইটুকু—$a : m = n : b$ করা মাত্র,—আর কিছুমাত্র জটিলতা নাই। যেটুকু আছে, প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় তা নগণ্য।

এবার উপরের উদাহরণে যে রাশিমালাটি গ্রহণ করা হয়েছে, তাতেই এই পদ্ধতির প্রয়োগ দেখানো যাক।

প্রদত্ত রাশিমালার মধ্যপদের সহগ হচ্ছে 17। এখন, 17-কে এমন দুটি অংশ 'm' ও 'n'-এ বিভক্ত করতে হবে যাতে $a:m = n:b$ হয়। যেহেতু এখানে $a = 1$ এবং $b = 30$, সুতরাং $1 : m = n : 30$ পাওয়া যাচ্ছে। স্পষ্টত $17 = 2 + 15$ বা $15 + 2$ হলে তবেই অনুপাত দুটি সমান হয়। কারণ $1 : 2 = 15 : 30$ $(= 1 : 2)$।

এখন তোমরা হয়তো প্রশ্ন করবে, "বেশ, শর্ত পূরণ করে তো মধ্যপদের সহগকে দু'অংশে বিভক্ত করলাম। কিন্তু তাতে উৎপাদক নির্ণয়ের কতদূর কি হলো?"

আমি বলব, "যেইমাত্র তোমরা অনুপাত নির্ণয় করেছ, তখনই একটি উৎপাদক নির্ণয় করে ফেলেছ! যেহেতু অনুপাত (1 : 2), সুতরাং প্রথম অংশ **চল** আর দ্বিতীয় অংশ **ধ্রুবক**। অতএব একটি উৎপাদকে $(x + 2)$ (প্রদত্ত রাশিমালায় x হচ্ছে **চল**।)।

তোমার কোন বন্ধু যে এই লেখাটি শুনছিল সে হয়তো প্রশ্ন করবে, "আর একটা উৎপাদক কি করে বার করা যাবে?"

হ্যাঁ,—এবার সে কথাতেই আসছি। দ্বিতীয়টিকে খুঁজে বার করতে একটুও কষ্ট নাই। কেবল সামান্য একটু ভাগ করতে হবে, এবং তা মুখে মুখে করতে কোন অসুবিধে নাই। সেই ভাগের নিয়মটি হচ্ছে: প্রদত্ত রাশিমালার প্রথম ও শেষ পদকে যথাক্রমে নির্ণীত উৎপাদকের প্রথমপদ ও শেষপদ দ্বারা ভাগ করতে হবে। আমাদের উদাহরণের অঙ্কটি নেওয়া যাক:

$$\frac{x^2}{x} + \frac{30}{2} = x + 15$$

সুতরাং $x^2 + 17x + 30 = (x + 2)(x + 15)$।

পদ্ধতিটি নতুন বলে এবং পড়ে বুঝতে হচ্ছে বলে হয়তো সামান্য একটু সময় নেবে। কিন্তু দু-চারটি অঙ্ক নিয়ে অভ্যাস করলে এধরনের অঙ্ক মুখে মুখে কষে ফেলতে পারবে।

আগেই বলেছি দ্বিঘাত রাশিমালার মধ্যপদ বিশ্লেষণ পূর্বক উৎপাদক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তোমাদের পাঠ্যপুস্তকে একাধিক পদ্ধতি বা নিয়ম আছে। কিন্তু এইমাত্র আমরা যে অভিনব পদ্ধতির কথা আলোচনা করলাম, এই একটি মাত্র পদ্ধতি দিয়ে অনেক ধরনের অঙ্ক কষা যায়। যেমন, মনে কর, $2x^2 + 5x + 2$ রাশিটির উৎপাদক নির্ণয় করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রচলিত যে পদ্ধতির কথা আলোচনা করা হয়েছে, তা আর প্রযোজ্য হচ্ছে না,—একটু অন্য রকম করে প্রয়োগ করতে হবে। কিন্তু আমাদের নতুন পদ্ধতিটি এখানেও সমানভাবে প্রযোজ্য। আচ্ছা, প্রয়োগ দেখানো যাক।

$$2x^2 + 5x + 2$$

মধ্যপদের সহগ = 5। $a:m = n:b$—এই শর্তে 5-কে দুটি অংশে বিভক্ত করতে হবে। স্পষ্টস, $5 = 1 + 4$ বা $4 + 1$। সুতরাং অনুপাত $= 2:1 = 4:2$ $(= 2:1)$। অতএব, প্রথম উৎপাদক $= (2x + 1)$।

$$\text{দ্বিতীয় উৎপাদক} = \frac{2x^2}{2x} + \frac{2}{1} = x + 2$$

$$\therefore\ 2x^2 + 5x + 2 = (2x + 1)(x + 2)।$$

এই যে অঙ্ক কষার অভিনব পদ্ধতির কথা বললাম এই পদ্ধতি বা নিয়ম তথাকথিত কোন গণিতবিদের আবিষ্কার নয়। এর আবিষ্কারক আমাদের দেশের এক ঋষিকল্প মানুষ। তাঁর নাম শঙ্করাচার্য ভারতীকৃষ্ণ তীর্থজী মহারাজ। তিনি গণিতের অনেক নতুন অথচ অতি

সহজ পদ্ধতি আবিষ্কারের কথা লিখে গেছেন তাঁর "বৈদিক গণিত" গ্রন্থ (Vedic Mathematics)। তাঁর আবিষ্কৃত সূত্র ও নিয়মগুলি খুব ছোট,…এমন কি কোনটা কোনটা একটিমাত্র কথায়। এগুলি মনে রাখা সহজ, প্রয়োগ করা আরো সহজ। এখানে আমরা যে সূত্রটি ব্যবহার করেছি তা হচ্ছে "আদ্যমাদ্যেনান্ত্যমন্ত্যেন,"—…এর অর্থ **"প্রথমটি প্রথম দ্বারা এবং শেষেরটি শেষের দ্বারা"**। উপরের অনুপাত নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এবং দ্বিতীয় উৎপাদক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এই সূত্র প্রযুক্ত হয়েছে।

শেষে শঙ্করাচার্যজী আবিষ্কৃত আর একটি ছোট্ট সূত্রের কথা বলি। এই সূত্রের সাহায্যে যে-কোন রাশিমালার উৎপাদক নির্ণয়ের পর তা ঠিক হয়েছে কিনা পরীক্ষা করা যাবে।

সূত্র ঃ গুণিতসমুচ্চয় ঃ সমুচ্চয়গুণিত ঃ…এর অর্থ হচ্ছে, **নির্ণীত উৎপাদকের সহগগুলির সমষ্টির গুণফল প্রদত্ত রাশিমালার সহগগুলির সমষ্টির সমান।**

দু'একটি উদাহরণের সাহায্যে এই সূত্রের সত্যতা যাচাই করা যাক এবার।

উদাহরণ ঃ $6x^2+13x+6=(2x+3)(3x+2)$

এখানে, রাশিমালার সহগগুলির সমষ্টি = $6+13+6=25$

নির্ণীত উৎপাদকের সহগগুলির সমষ্টির গুণফল = $(2+3)(3+2)=5\times5=25$

যেহেতু, বামপক্ষ = ডানপক্ষ, সুতরাং অঙ্কের নির্ভুলতা প্রমাণিত হলো।

এবার একটি ত্রিমাত্রিক রাশি নেওয়া যাক ঃ

$x^3+6x^2+11x+6=(x+1)(x+2)(x+3)$

বামপক্ষ = $1+6+11+6=24$, ডানপক্ষ = $(1+1)(1+2)(1+3)=2\times3\times4=24$

সুতরাং, নির্ণীত উৎপাদকগুলি নির্ভুল।

তোমাদের পাঠের মূল্যায়নের জন্য কয়েকটি অঙ্ক দেওয়া হলো ঃ

A. i) x^2+5z+6, ii) x^2+4x+3, iii) $x^2+8x+15$

B. i) $2x^2+7x+5$, ii) $2x^2+9x+10$, iii) $6x^2+37x+6$

C. i) $x^2-12x+32$, ii) $3x^2+x-14$, iii) $7x^2-6x-1$

পোঃ ঠাকুরাণীচক, হুগলী,
পিন কোড নং—৭১২৬১৩

কৃত্রিম ইনসুলিন

● অসীম আচার্য

ইনসুলিন কি? প্রথম এ সম্বন্ধে বুঝে নেব। তারপর আসা যাবে কৃত্রিম ইনসুলিনের কথায়। কি বলো? মানুষের পুষ্টিতন্ত্র সমন্ধে পড়তে গিয়ে তোমরা দেখেছো পাকস্থলীর নীচে আড়াআড়িভাবে ঘি-রঙের একটি লম্বাটে পাচকগ্রন্থি থাকে এবং এর নাম হলো অগ্ন্যাশয়। আর এই অগ্ন্যাশয় থেকেই এক ধরণের হরমোন নিঃসৃত হয় যার নাম হলো ইনসুলিন। এবার এর কাজ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাক।

আমরা ভাত, রুটি, আলু ইত্যাদি কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করি। এগুলো শ্বেতসারজাতী খাদ্য। বহু শর্করা অণুযুক্ত খাদ্য। পাচনের ফলে এ সমস্ত বহু শর্করা অণুযুক্ত খাদ্য এক শর্করা অণুযুক্ত অর্থাৎ গ্লুকোজ-এ পরিবর্তিত হয়। যকৃৎ-এ অতিরিক্ত গ্লুকোজ পৌঁছলে তা গ্লাইকোজেনে পরিবর্তিত হয়। যকৃৎ ও পেশীতে এই গ্লাইকোজেন সঞ্চিত থাকে। যকৃৎ ও পেশীতে এই গ্লাইকোজেন গঠন ও শক্তি উৎপাদন ইনসুলিন হরমোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ নির্দিষ্ট মাত্রায় থাকে। গ্লুকোজের পরিমাণ এই মাত্রার বেশী হয়ে গেলে ইনসুলিন হরমোনের ক্রিয়ায় ঐ অতিরিক্ত গ্লুকোজ গ্লাইকোজেনে পরিবর্তিত হয়ে তা সঞ্চিত থাকে। এই ইনসুলিন উৎপাদনে ঘাটতি দেখা দিলে ডায়াবিটিস বা মধুমেহ রোগ হয়। এই রোগে রক্তের শর্করা প্রস্রাবের সঙ্গে বের হতে থাকে। উপযুক্ত চিকিৎসা না হলে রোগী দিন দিন রোগা হতে হতে ক্রমশঃ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এ সমস্ত রোগীদের ইনসুলিনের ঘাটতি পূরণের জন্য ইনসুলিন ইনজেকশন দিলে অবস্থার উন্নতি হয়।

জীবের দেহ থেকে পাওয়া এই ইনসুলিনের বেশ দাম পড়ে যায়। তাছাড়া পর্যাপ্ত রোগীর তুলনায় এই জৈব ইনসুলিনের উৎপাদন কম। তাই বিজ্ঞানীরা চিন্তা করলেন যদি রসায়নাগারে অগ্ন্যাশয়ের সাহায্য ছাড়াই এই একই গুণসম্পন্ন ইনসুলিন তৈরি করা যায় তাহলে তা সহজলভ্য ও দামেও কম পড়বে এবং বহু দরিদ্র রোগীও হয়ত আশা করতে পারে। যেই ভাবা সেই কাজ। বিভিন্ন প্রান্তের বিজ্ঞানীরা লেগে গেলেন কাজে। ক্যালিফোর্ণিয়ার কয়েকজন বিজ্ঞানী রসায়নাগারে তৈরি করে ফেললেন ইনসুলিন যা আমাদের অগ্ন্যাশয় থেকে নিঃসৃত ইনসুলিনের সমগুণসম্পন্ন। আর একেই বলে কৃত্রিম ইনসুলিন।

যোগেন্দ্র নগর, আগরতলা ত্রিপুরা

অধ্যাপক আবদুস সালাম

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

বিজ্ঞানজগতে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান হচ্ছে নোবেল পুরস্কার। আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশে বিজ্ঞানে সর্বপ্রথম নোবেল পুরস্কার লাভ করেন চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরামন ১৯৩০ সালে। তিনি আমাদের কলকাতা মহানগরীতে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কাল্‌টিভেশন অফ সায়েন্স-এ গবেষণা করে পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। তারপর আর বহু বছর কোনো ভারতীয় বিজ্ঞানী বা উপমহাদেশের বিজ্ঞানী এই সুদুর্লভ সম্মান পান নি। ১৯৬৯ সালে অবশ্য জন্মসূত্রে ভারতীয় এবং বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক ডঃ হরগোবিন্দ খোরানা চিকিৎসা-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। তার ১০ বছর পরে অর্থাৎ ১৯৭৯ সালে এই উপমহাদেশের আর একজন পদার্থ-বিজ্ঞানী বিজ্ঞানের এই সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করেন। তিনি হচ্ছেন বর্তমানে পাকিস্তানের নাগরিক ও লণ্ডনে বসবাসকারী অধ্যাপক আবদুস সালাম। অধ্যাপক সালাম অবশ্য এককভাবে এই পুরস্কার পান নি, তাঁর সঙ্গে আর দুজন মার্কিন বিজ্ঞানী অধ্যাপক স্টিভেন ভিনবার্গ এবং অধ্যাপক শেলডান এল গ্লাশো পুরস্কার পেয়েছিলেন। পদার্থ-বিজ্ঞানে যে অনন্য কাজের জন্যে তাঁদের নোবেল পুরস্কার সম্মানিত করা হয় তা বিজ্ঞানের ভাষায় 'ইউনিফায়েড ফিলড্ থিওরী' বা 'একক ক্ষেত্র তত্ত্ব' নামে পরিচিত।

পদার্থ-বিজ্ঞানীদের মতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বস্তুকণা থেকে আরম্ভ করে গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদির সৃষ্টি, রূপান্তর ও কার্যকলাপের মূলে আছে চার রকম মৌলিক বল বা শক্তি। এই চারটি শক্তি হচ্ছে 'স্ট্রং ফোর্স' বা প্রবল বল, 'ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক ফোর্স' বা তড়িৎ-চৌম্বক বল, 'উইক ফোর্স' বা দুর্বল বল এবং 'গ্রাভিটেশন ফোর্স' বা মহাকর্ষ বল। পরমাণুর নিউক্লিয়াসে বা কেন্দ্রীনে প্রোটন ও নিউট্রন কণারা যে বলের দ্বারা আবদ্ধ থাকে, তাকে বলা হয় প্রবল বল। তড়িৎ ও চৌম্বক শক্তির পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার দরুন যে বলের সৃষ্টি হয়, তাকে বলা হয় তড়িৎ-চৌম্বক বল। যে শক্তির সাহায্যে কোনো মৌল পদার্থ তার অন্তর্নিহিত শক্তির ক্ষরণ ঘটিয়ে (বিটা রশ্মি ত্যাগ করে) ভিন্নতর পদার্থে রূপান্তরিত হয়, তাকে বলা হয় দুর্বল বল। আর যে শক্তির সাহায্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে গ্রহ-নক্ষত্রাদি পরস্পরকে এবং বস্তুনিচয়কে তাদের কেন্দ্রাভিমুখে আকর্ষণ করে তাকে বলা হয় মহাকর্ষ বল।

আপাতদৃষ্টিতে এই চারটি বল এক একটি পৃথক সত্তা বলে মনে হলেও বিজ্ঞানীরা মনে করেন এদের মূল উৎস হয়তো একই। এই উদ্দেশ্যে মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন তাঁর জীবনের শেষ ২৫ বছর এই চারটি বলকে একসূত্রে অর্থাৎ একক ক্ষেত্রতত্ত্বে বেঁধে দেবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তিনি সফল হতে পারেন নি। আমাদের দেশের প্রখ্যাত পদার্থ-বিজ্ঞানী আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুও এবিষয়ে অনেকখানি অগ্রসর হয়েছিলেন। অধ্যাপক সালাম এবং তাঁর সতীর্থ দুজন বিজ্ঞানী প্রথম প্রমাণ করেছেন, দুর্বল বল এবং তড়িৎ-চৌম্বক বলের মধ্যে মিল আছে, অর্থাৎ এরা যেন টাকার এপিঠ-ওপিঠ।

এবছর (১৯৮১) গত জানুয়ারি মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্তন উৎসবে অধ্যাপক সালামকে দীক্ষান্ত ভাষণ দেবার জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হয়। অধ্যাপক সালাম এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছিলেন একটি শর্তে যে, এই সঙ্গে লাহোরে তাঁর ছাত্রজীবনের শিক্ষক, বর্তমানে কলকাতা নিবাসী অধ্যাপক অনিলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়কেও বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সম্মানিত করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁর এই প্রস্তাবে সম্মত হওয়ায় অধ্যাপক সালাম দীক্ষান্ত ভাষণ দিয়েছিলেন কিন্তু কলকাতায় পদার্পণ করে প্রথমেই তিনি ছুটে গিয়েছিলেন তাঁর মাস্টারমশাইকে শ্রদ্ধা জানাতে এবং

কলকাতা ত্যাগ করার আগে আর একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। অধ্যাপক সালামের এই গুরুভক্তি আমাদের অভিভূত করেছিল। আজকের যুগে শিক্ষকের প্রতি ছাত্রের এই প্রগাঢ় শ্রদ্ধা যেন ভাবাই যায় না।

২১ জানুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে দীক্ষান্ত ভাষণ দেবার পর অপরাহ্নে আচার্য জগদীশচন্দ্রের পুণ্য স্মৃতি বিজড়িত বসুবিজ্ঞান মন্দিরে তরুণ বিজ্ঞানীদের এক সমাবেশে অধ্যাপক সালামের সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল। এমন অমায়িক, সরল, সাধাসিধা মানুষ আমরা খুব কমই দেখেছি। তরুণ বিজ্ঞানীদের উদ্দেশে তিনি কয়েকটি অপ্রিয় সত্য কথা বলেছিলেন। এই উপমহাদেশের (ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ) ছাত্রছাত্রী, গবেষক ও বিজ্ঞানীদের মধ্যে পড়াশোনা ও গবেষণার বিষয়ে একাগ্রতা ও পরিশ্রমের অভাব দেখা যায়। এটা বাঞ্ছনীয় নয়।

সর্বসাধারণের মধ্যে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের ওপর এই সভায় তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন। মানব-কল্যাণে বিজ্ঞানীরা যে গবেষণা ও উদ্ভাবন করলেন, তার খবর জনসাধারণকে জানাতে হবে, নইলে তার সার্থকতা কোথায়! অধ্যাপক সালামের এই মানব-দরদ আমাদের মুগ্ধ করেছে।

গ্যালেন (১৩০-১৯৯ খৃস্টাব্দ)

প্রখ্যাত গ্রীক দার্শনিক ইউডিমস যখন কঠিন জ্বরে আক্রান্ত হন, তখন রোমের সে সময়কার বিশিষ্ট চিকিৎসকেরা সবরকম চেষ্টা করেও সফল হতে পারলেন না। তাঁর জীবনসংশয়ের আশঙ্কা দেখা দেওয়ায় ইউডিমস তরুণ গ্রীক চিকিৎসক গ্যালেনকে ডেকে পাঠালেন।

গ্যালেন যখন ইউডিমসকে দেখতে এলেন তখন রোমান চিকিৎসকেরা তাঁকে ব্যঙ্গভাবে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত অর্থাৎ কার অনুগামী? গ্যালেন উত্তর দিলেন, তিনি কোনো সম্প্রদায়ভুক্তই নন এবং হিপোক্রেটিস বা অপর কোনো পূর্বসুরির চিকিৎসাবিধানকে শেষ কথা বলে মেনে নিতে প্রস্তুত নন। তাঁর এই স্পষ্ট উক্তিতে রোমান চিকিৎসকেরা স্বভাবতই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু গ্যালেন তাঁর চিকিৎসাপদ্ধতির সাহায্যে স্বল্পকালের মধ্যে ইউডিমসকে সম্পূর্ণ নিরাময় করে তুললেন। এরপর সমগ্র রোমে চিকিৎসক হিসাবে গ্যালেনের সুনাম ছড়িয়ে পড়ে।

১৩০ খৃস্টাব্দে এশিয়া মাইনরের রাজধানী পারগামন-এ গ্যালেন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা নিকন ছিলেন এক ধনী কৃষক এবং গণিত, দর্শন ও প্রকৃতি-বিজ্ঞানে শিক্ষিত। ক্ষেত-খামারে বাবার সঙ্গে থেকে বালক গ্যালেন প্রাণী ও উদ্ভিদের অনেক রহস্য জানতে পেরেছিলেন। যখন তাঁর বয়স ১৪ বছর, তখন বাবা তাকে পারগামন-এর শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের কাছে শিক্ষা নিতে পাঠান। অ্যারিস্টটলের বই পড়ে গ্যালেন জীববিদ্যায় প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন এবং জানতে পারেন প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের দ্বারাই জীব-বিজ্ঞানীকে প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে হয়।

বাবার ইচ্ছানুসারে গ্যালেন ১৭ বছর বয়সে হিপোক্রেটিসের প্রিয় শিষ্য স্যাটিরাস-এর অধীনে ভেষজবিদ্যা ও শারীরস্থান বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন। ২০ বছর বয়সে বাবার আকস্মিক মৃত্যুতে গ্যালেন প্রথমে খুব মুষড়ে পড়েন। কিন্তু পরে বাবার ইচ্ছাপূরণের জন্যে তিনি চিকিৎসাবিদ্যার তৎকালীন পীঠস্থান আলেকজেন্দ্রিয়ায় চলে এলেন তাঁর শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে। এখানে ৪ বছর কাল প্রখ্যাত শিক্ষকদের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং সেখানকার বিখ্যাত গ্রন্থাগারে জ্ঞান আহরণ করে গ্যালেন তাঁর সময়ে সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসকরূপে পরিগণিত হলেন। চিকিৎসক হিসাবে গ্যালেন পরীক্ষা ও প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন। তিনি বলতেন, নিজে পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণ না করে কোনো কিছু মেনে নেওয়া উচিত নয়। দ্বিতীয় শতাব্দীতে গ্যালেনই ছিলেন প্রথম পর্যবেক্ষক-শারীর তত্ত্ববিদ। মানুষের দেহে পেশীর ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে গ্যালেন বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। বিশেষ বিশেষ পেশীর যেসব নামকরণ গ্যালেন করেছিলেন তার অনেকগুলি শারীরস্থান সম্পর্কিত আধুনিক গ্রন্থে ব্যবহার করা হয়। শুধু মানুষের পেশী নয়, স্নায়ুতন্ত্র সম্পর্কেও গ্যালেন অনেক পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণ করেছিলেন এবং তার ফলে মানবদেহের বহু রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল।

মানুষের পেশী ও স্নায়ুতন্ত্র সম্পর্কে পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণ করে গ্যালেন যেসব বিবরণ লিখে গিয়েছিলেন তার সবগুলি কালের বিচারে যথার্থ বলে প্রতিভাত হয় নি। তবু চিকিৎসাবিদ্যার অন্যতম পথিকৃৎ হিসাবে গ্যালেন-এর নাম আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়।

---

২২ ট্যাগোর ক্যাসল স্ট্রীট, কলি-৫

বনচঁাড়াল গাছের রহস্য

দিবাকর সেন

গাছটির নাম বনচাঁড়াল। শুদ্ধ বাংলায় বনচণ্ডাল। ইংরেজীতে Desmodium gyrans বা Indian Telegraphic plant। এর কাণ্ডের প্রতি পর্বে তিনটি করে পাতা থাকে। মাঝের পাতাটি বড় আর দু'পাশে দুটি ছোট পাতা। যেন দুটি হাত।

বনচাঁড়াল পাতা

এই ছোট পাতা দুটি সদাই কর্মচঞ্চল। অনেকটা যেন রাস্তার মোড়ের ট্রাফিক-পুলিশের মত। একবার পাতা দুটি উপরে উঠছে আর একবার নিচের দিকে নামছে। বনচাঁড়ালের এই স্বতঃস্পন্দন আপাত কোন কারণ ছাড়াই খালি চোখে দেখতে পাওয়া যায়। এর জন্যেই হয়ত বিজ্ঞানীদের মনে গাছটি সম্পর্কে জানার কৌতূহল জেগেছিল সেই প্রাচীনকাল থেকে।

সাধারণ মানুষের ধারণা বেশ মজার। গ্রামবাংলার "গুণীনরা" এই স্পন্দনশীল পাতাগুলি "বশীকরণের" কাজে ব্যবহার করতেন। তাদের ধারণা ছিল কোন বিশেষ দিনে কোন বিশেষ সময়ে পাতাদুটি স্পন্দিত হওয়ার সময় যখন উপরের দিকে ওঠে তখন এক নিশ্বাসে পাতা দুটি কেটে কোন খাওয়ার জিনিসের সাথে কাউকে খাইয়ে দিলে তাকে "বশ" করা যায়। গ্রামের রাখাল ছেলেদের ধারণা ছিল, হাতের তুড়ি দিলেই পাতাদুটি নাচ শুরু করে। এতো গেল আমাদের দেশের কথা। বিদেশেও নানাধরনের ব্যাখ্যা শোনা যেত। শোনা যায় ইংলণ্ডের রানী নাকি একবার পুরস্কারও ঘোষণা করেছিলেন গাছটির সম্পর্কে আরও খোঁজখবর পাওয়ার আশায়।

আচার্য জগদীশচন্দ্রের আগে যে সব বিজ্ঞানী এই স্পন্দনের গতি-প্রকৃতি নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন, তাঁরা কেউই কৃতকার্য হননি। অন্তরায় ছিল সঠিক সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আবিষ্কারের অক্ষমতা। সেই অক্ষমতাই হয়তো গাছটিকে সেকালে রহস্যময় করে তুলেছিল সাধারণ মানুষের কাছে। তখনকার দিনে ড্রামরেকর্ডারই ছিল উদ্ভিদের শরীর-চর্চার নির্ভরযোগ্য ও উন্নতমানের যন্ত্র।

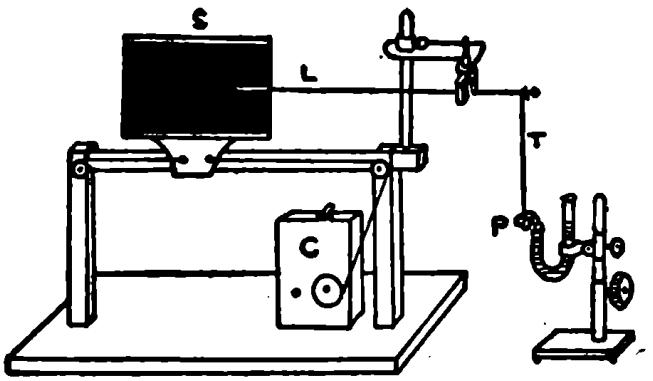

Plant Phytograph যন্ত্র

P—পাতা, T—সিল্কের সুতো, L—কাচের লিভার

C—ঘড়িকল, S—কাচের প্লেট

জগদীশচন্দ্র দেখলেন তা দিয়ে কখনোই সম্ভব নয় গাছের কোন সূক্ষ্ম পরিবর্তন লিপিবদ্ধ করা। অনেক পরিশ্রমের পর জগদীশচন্দ্র আবিষ্কার করলেন প্ল্যান্ট ফাইটোগ্রাফ যন্ত্র।

অনেক উন্নতমানের। অনেক সূক্ষ্ম। গাছের পরীক্ষাধীন পাতাটিকে রাখলেন একটি কাচের U টিউবে (জলভর্তি)। একটি সিল্কের সরু সুতো দিয়ে যুক্ত করলেন একটি কাচের তৈরী (জুয়েলের উপর বসানো) লিভারের সাথে। এই লিভারটিকেই লেখনী হিসেবে কাজে লাগালেন। এবার লেখবার জন্য ভুষোমাখানো একটি কাচের প্লেটের সংযোজন ঘটালেন সুন্দর ভাবে। ভুষোমাখানো প্লেটটিকে ঘড়িকলের সাহায্যে প্রতি চার সেকেণ্ড অন্তর নিজে থেকে সামনের দিকে এগিয়ে এসে লিভারের মুখ থেকে একটি ছোঁয়া নিয়ে পেছিয়ে যাবার ব্যবস্থা করলেন। সেই সাথে একই যান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্লেটটিকে ধীরে ধীরে বা'দিক থেকে ডানদিকে চালনা করলেন। এ ব্যবস্থা হলো নিখুঁত। ঘর্ষণজনিত ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা খুবই কমে গেল। লিভার

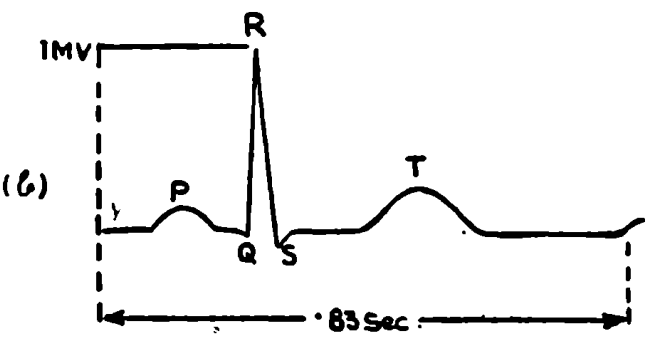

·মানুষের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন

ব্যবস্থায় ছয়গুণ বড় করে তরুলিখন নিলেন জগদীশচন্দ্র। আশ্চর্য সে তরুলিপি। উনি তুলনা করলেন প্রাণীদেহের হৃদস্পন্দন লিপির সাথে। মিল রয়েছে যথেষ্ট, তাপের তারতম্য ঘটালেন। দেখলেন প্রাণীর স্পন্দনের মতই বনচাঁড়ালের স্পন্দন বেড়ে গেল। পিলোকার্পিন, আট্রোপিন, ব্রোমাইড প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করে বিভিন্ন বাস্তবধর্মী পরীক্ষা চালালেন। প্রতিক্রিয়া সবই হ'লো প্রাণীহৃৎপিণ্ডের উপর প্রয়োগের অনুরূপ।

এসব পরীক্ষার ফলাফল জগদীশচন্দ্রকে আরও গভীরে টেনে নিয়ে গেল। গ্যালভানোমিটারকে দরকার মত পাল্টে কাজ আরম্ভ করলেন। দেখলেন প্রাণীর মত বৈদ্যুতিক সাড়ার অস্তিত্ব রয়েছে এতে। মিল রয়েছে ছোট পাতাটির চলনের সাথে। তুলনামূলক পরীক্ষা করলেন ব্যাঙের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের সাথে। রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগের ফলও উভয়ের মূলগত সাদৃশ্যকেই ইঙ্গিত করলো। উপসংহারে এলেন জগদীশচন্দ্র "এই তথাকথিত স্বতঃস্পন্দনের ব্যাপারটি আপনা থেকেই ঘটে না, পূর্বলব্ধ বহিরাগত উত্তেজনার ফলস্বরূপই সেটা প্রকাশ পায়।"

জগদীশচন্দ্রই প্রথম প্রমাণ করেন প্রাণীদেহের মত সব গাছের ভেতরেই বৈদ্যুতিক সাড়ার অস্তিত্ব রয়েছে।

আচার্য জগদীশচন্দ্রের মৃত্যুর প্রায় ত্রিশবছর পরে ষাটের দশকে প্রয়াত বিজ্ঞানী অধ্যাপক দেবেন্দ্রমোহন বসু, বিনয়কৃষ্ণ দত্ত ও আশুতোষ গুহঠাকুর তা বসুবিজ্ঞান মন্দিরে জগদীশচন্দ্রের এই ফাইটোগ্রাফ যন্ত্রের সাথে ইলকট্রনিক যন্ত্রের সংযোগ ঘটিয়ে বনচাঁড়াল গাছের বৈদ্যুতিক লিপি নিয়ে পরীক্ষা করেন। প্রাপ্তলিপি যেন মানুষের হৃৎপিণ্ডের বৈদ্যুতিক সাড়ার প্রতিচ্ছবি। পার্থক্য যেটুকু আছে তা হলো শুধু সময়ের। নীচে প্রাপ্তলিপির

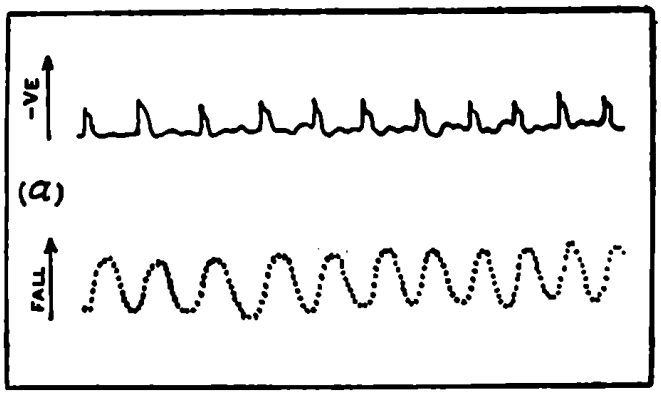

বনচাঁড়ালের বৈদ্যুতিক সাড়া (উপরে) পাতার চলন (নিচে)

ছবিটি দেওয়া হলো।

পরিশেষে এদের আর একটি মজার পরীক্ষার কথা বলব। বনচাঁড়াল গাছের কচি পাতাগুলি সারাদিন স্পন্দনের পর রাত্রিবেলা থেমে থাকে, কিন্তু পরিণত পাতাগুলির স্পন্দন চলতে থাকে অবিরাম। পরীক্ষাধীন কচি বনচাঁড়ালের পাতার ওপর গ্লুকোজ প্রয়োগ করা হলো। দেখা গেল কচি পাতাটি পরিণত পাতাগুলির মতই স্পন্দিত হচ্ছে সারাদিন সারারাত। গ্লুকোজ প্রয়োগ বন্ধ রেখে আবার শুধু জল দেওয়া হলো। ফলে দেখা গেল পরীক্ষাধীন পাতাটি আবার আগের মত রাত্রিবেলাতে থেমে থাকছে। কারণ হিসেবে জানা গেল কচিপাতার মধ্যে ক্লোরোফিলের ভাগ অল্প থাকায় উপযুক্ত পরিমাণ কার্বোহাইড্রেট জমা হতে পারে না। তাই কচি পাতাগুলি রাত্রিতে থেমে থাকে।

বোস ইনসটিটিউট
৯২/১ এ. পি. সি. রোড, কলিকাতা-৯

খুদে বৈজ্ঞানিক / দিলীপ দাস

বিজ্ঞানের ভেল্কি

যাদুসম্রাট এ. সি. সরকার

সে বার লণ্ডনে থাকাকালে একটি বিশেষ ইংরেজ পরিবারের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল বেশ আকস্মিক ভাবেই। একদিন দুপুরের দিকে লণ্ডনের ইণ্ডিয়া হাউজ থেকে বেরুচ্ছি এমন সময় একটি ১০।১২ বছরের ছেলে ছুটে এসে বললো, "আপনি যে বিশ্ববিখ্যাত ভারতীয় যাদুকর মিঃ এ. সি. সরকার তা আমার ভালভাবেই জানা আছে। আমার মা আসছেন। ওঁর সঙ্গে বাজী ধরেই আমি নিজে নিজে ছুটে এসেছি আপনার সঙ্গে পরিচয় করতে। অপরাধ হয়ে থাকলে ক্ষমা করবেন।"

কথা শেষ হতে হতে একজন মধ্য বয়সী মোটাসোটা মহিলা এসে দাঁড়াল সামনে। সঙ্কোচ ভরা গলায় বললেন, "দেখুন দেখি দুষ্টু ছেলের কাণ্ড, রাস্তার মধ্যে আপনাকে আটকে দিয়ে আপনার কাজের কত ক্ষতি করে দিল। আপনার জন্য কি কোন গাড়ি অপেক্ষা করছে? যদি তা না হয় তবে অনুগ্রহ করে আমাদের গাড়িতে আসুন, আমরা পৌঁছে দিচ্ছি।

"মিছি মিছি আপনাদের বিব্রত করে কি দরকার? —একটা ট্যাকসি ডেকে আমি চলে যাবখন।" ভদ্র মহিলাকে নিরস্ত করার জন্য বলি।

"না না, সে কী কথা। আমাদের সঙ্গে গাড়ী থাকতে আপনি ট্যাক্সি নেবেন কেন? অনুগ্রহ করে আসুন।"

পথে যেতে যেতে গাড়িতেই পরিচয় হল ভদ্রমহিলার সঙ্গে। তিনিই গাড়ি চালাচ্ছিলেন। ওঁর স্বামী মিঃ স্মিথ সামরিক অফিসার হিসাবে কিছুদিন কোলকাতায় ছিলেন। ছেলেটির নাম স্যামুয়েল, সংক্ষেপে স্যাম। ও ওদের ছোট ছেলে। বড় ছেলে সম্প্রতি কেম্ব্রিজে একটা কলেজে চাকুরী পেয়েছে। সামরিক বিভাগ থেকে অবসর নেবার পর মিঃ স্মিথ এখন একটা ছোটখাটো ব্যবসা খুলেছেন। বাড়ি করেছেন লণ্ডনের সাউথ কেন্‌সিংটন পাড়াতে। স্যামের কথা বলতে গিয়ে উনি অনেক কথার সঙ্গে ওর অদ্ভুত ম্যাজিক প্রীতির কথাও বলতে ভুললেন না। কথায় কথায় পথ ফুরিয়ে পৌঁছে গেলাম আমার হোটেলে। ভেতরে এসে এক কাপ কফি খাবার জন্য অনেক পিড়ারপীড়ি করলাম। আর একদিন আসবেন মিঃ স্মিথকে সঙ্গে নিয়ে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিলেন মিসেস স্মিথ।

এর পরে ঘনিষ্ঠতা আরও বেড়েছে। ওঁরাও আসেন আমার হোটেলে আমিও যাই ওদের বাড়ি। লাঞ্চ-ডিনারের নিমন্ত্রণ প্রায়ই পাই ওদের বাড়ি থেকে। বেশীর ভাগ দিনই নানা অজুহাতে নিমন্ত্রণ ফিরিয়ে দিই। সবচেয়ে বেশী উৎসাহ স্যামের। ও যখন না ছোড়বান্দার মত ধরে বসে, তখন আর না গিয়ে পারি না। এমনি এক উপলক্ষ ছিল স্যামের জন্মদিনের পার্টি। বারবার বলে গেছে। ফোন করেছে বারবার। অবশেষে স্যামের চাপে প'ড়ে মিঃ স্মিথ নিজে গাড়ি নিয়ে আমাকে নিয়ে গেলেন হোটেল থেকে। উপহার হিসেবে আমি সঙ্গে নিলাম একটা কাগজে মোড়া প্যাকেট।

আমি ওদের বাড়ি পৌঁছুতেই স্যাম ছুটে এসে আমাকে অভ্যর্থনা করলো। তার পরে আমার হাতে উপহারের প্যাকেট দেখে অভিমান করে বললো—আর দশ জনের মত আপনিও আমার জন্য বাজার থেকে উপহার কিনে নিয়ে এলেন ভদ্রতা দেখানোর জন্য। কে চায় আপনার কাছে অমনিধারা উপহার?"

"আর দশ জনের মত বাজারে উপহার নয় এটা। যাদুকর যখন দিচ্ছে তখন তোমার ধরে নেয়াই উচিৎ ছিল যে এতে যাদুর ব্যাপার থাকবেই কিছু না কিছু।"

কথা শুনে উৎসাহ আর ঔৎসুক্যে চক্‌চক্ করে ওঠে স্যামের চোখ। "দেখি, দেখি;" বলে সে দু'হাত বাড়ায়।

"ধৈর্য ধর। ঠিক সময়ে দেখতে পাবে।" তার পাশ কাটিয়ে পাশের ঘরে যেতে যেতে বলি আমি।

একা একা পাশের ঘরে ঢুকে দরজায় ছিটকিনী তুলে দিই। তার পরে প্যাকেট খুলে ভেতরকার বস্তুগুলো টেবিলের উপরে নামাই; কাচের বাটিটার ভেতরে কিছুটা পরিষ্কার জল ঢেলে দিয়ে দোর খুলে স্যামকে ডাকি।

স্যামের পেছনে পেছনে ওর বাবা মা আর অন্যান্য অনেকে ঘরে ঢোকে। টেবিলের কাছে নিয়ে গিয়ে আমি স্যামকে দেখতে বলি কাচের বাটিতে জলে কী বস্তু ডোবানো আছে।

"ওরে ব্যাস, একী জিনিস? এমন সুন্দর চক্‌চকে ঝলমলে রূপোলী ডিম পেলেন কোথায়? চাঁদী দিয়ে বানিয়ে আনলেন বুঝি? তা, জলে ডুবিয়ে রাখলেন কেন? বাইরে বের করে হাতে দিন। একটু নেড়ে চেড়ে লোফালুফি করে দেখি মনের সুখে।"

"না হে, না, এ রূপকথার রাজ্যের আজব হাঁসের আণ্ডা। হাতের ছোঁয়া পেলেই এর যাদু হবে ঠাণ্ডা। যতক্ষণ এ যাদু মন্ত্র পড়া জলের তলায় আছে ততক্ষণই আছে এর যাদু-গুণ আর রূপোলী রূপ। মানুষের হাতে,

যাদু-জলের বাইরে এলেই এ হয়ে যাবে কুরূপ, কদাকার। বিশ্বাস না হয় তো পরখ করে দেখ।"

স্যাম এগিয়ে আসে। আমি তাকে সাহায্য করি। জলের তলায় একটা ৩ ইঞ্চি × ৩ ইঞ্চি লোহার জালের টুকরোর উপরে বসানো ছিল ডিমটা। সেই জালটার দু'ধার দু'হাতে ধরে স্যাম ডিমটাকে জালের টুকরো সুদ্ধ জল থেকে তুলে আনে। আরে ছ্যা ছ্যা এ কি কাণ্ড। কোথায় রূপোলী রূপ ঝলমল রুপোর ডিম? এ যে কালো কুচ্ছিৎ কুচকুচে অ্যালকাতরা বরণী আণ্ডা! কাণ্ড দেখে সবাই হতবাক। স্যাম তো রেগেমেগে ফেলেই দিতে যাচ্ছিল ডিমটা জানালা গলিয়ে।

ডিম বেঁধে নিয়ে সেটাকে সাবধানে ধরতে হবে এক কেরোসিন লম্ফের ধূমায়িত শিখার ওপরে যাতে ডিমটার আগা পাচা তলা সারা গায়ে ভুষো কালির আস্তরণ পড়ে আচ্ছা মতন। এরপর একটা ৩ ইঞ্চি লম্বা আর ৩ ইঞ্চি চওড়া লোহার জালের টুকরোর উপরে এই ভুষো মাখা ডিমটা রেখে সাবধানে তারটা খুলে নাও আর একটা সমান তলাওয়ালা কাচের বাটির মধ্যে এই ডিম শুদ্ধ জালটা রেখে বাটিটা পরিষ্কার জলে ভরে দাও। তাকিয়ে দেখ বাটিটা জলে ভরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই ভুষো মাখা কালো কুচ্ছিৎ ডিম রূপোর মত ঝলমল করছে। এ এক বৈজ্ঞানিক রহস্য। বৈজ্ঞানিক ম্যাজিকের বিস্ময়।

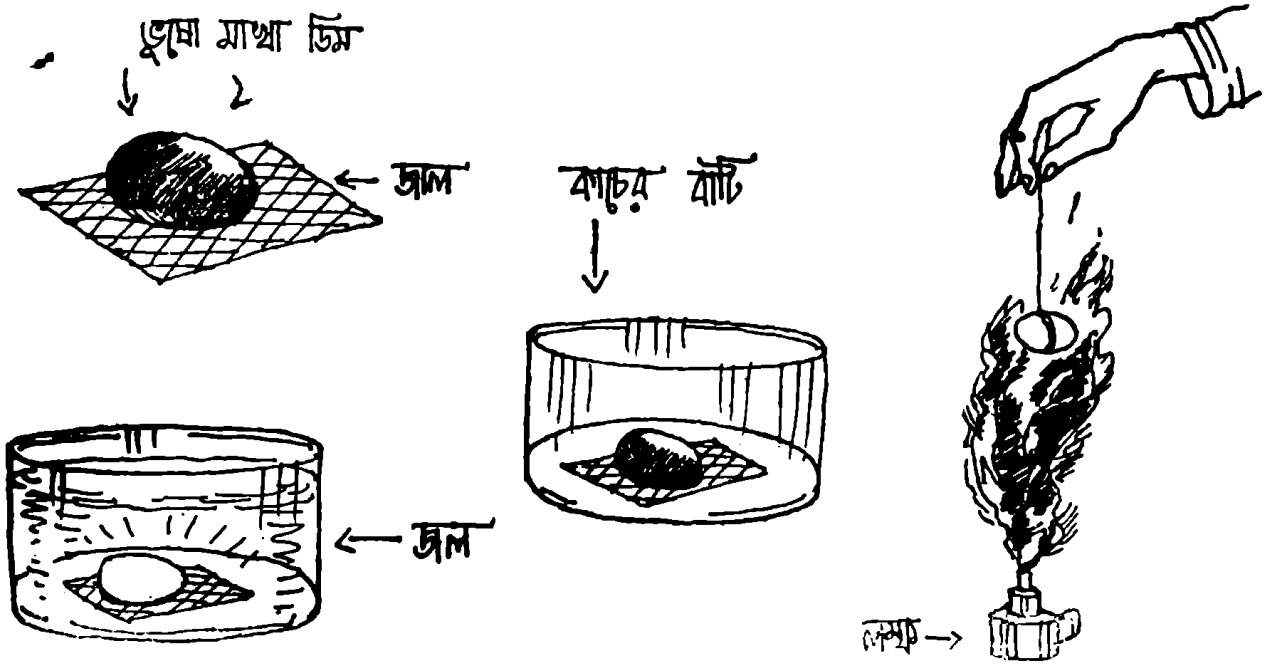

তাকে শান্ত করে ঐ কালো ডিমটা জালের টুকরোর উপরে বসানোর অবস্থাতেই আবার ডুবিয়ে দিতে বলি বাটির যাদু-জলে। জলে ডুবতেই যাদুর গুণে কালো ডিমটা আবার ঝলমল করে ওঠে রূপোলী দীপ্তিতে। যাদুমন্ত্র-পড়া জলের গুণ দেখে সবাই হন বিস্ময়ে হতবাক!

সত্যিই কি ওই জলে কোন যাদু মন্তরের প্রভাব টভাব ছিল? মোটেই না! ও ছিল মামুলী সাদা মাটা পরিষ্কার কলের জল। যে কোন জলেই এই অদ্ভুত ব্যাপারটা করা যাবে। চেষ্টা করে দেখ তোমরাও পারবে। তবে হ্যাঁ ধৈর্য ধরে একটু প্রস্তুত হয়ে নিতে হবে আগে থেকে।

টুকরো লম্বা সরু তারে একটা বড় সাইজের হাঁসের

কেরোসিন লম্ফের ধূমায়িত শিখার থেকে বেরিয়ে আসা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কার্বন বা কালির কণার পুরু আস্তরণ পড়ে ডিমের সারা দেহে। এই আস্তরণ জলে ভেজে না—ভিজতে পারে না। অধিকন্তু বাতাসের এক হালকা আস্তরণ ঘিরে রাখে এই কালির পলেস্তারাকে। এই বাতাসের অদৃশ্য আস্তরণ থেকে আলো প্রতিফলিত হতে থাকে জলের তলায়। এই প্রতিফলিত রশ্মি ঠিক আয়নায় প্রতিফলিত আলোরই মত দর্শকদের চোখে পড়ে আর জলে ডোবা ডিমটার সারা অঙ্গ আয়নার মত ঝকমক করতে থাকে। এই কারণেই ডিমটা এমন চকমকে রূপোলী দেখায়। করে দেখ। কেমন মজা!

ম্যাজিক ভিলা ১২/৬, সেলিমপুর রোড, কলিকাতা-৩১

অজানা মহাকাশে

১২

কি করে অন্য সবাইকে খুঁজে পাবো তাই ভাবছি।
কিন্তু হ্যাবোডরাই ওদের খুঁজে পেলো।
করেছিলো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারেনি। এ আমাকে খুব সাহায্য করেছে।
আমরা ভেবেছি হোবার-স্মাই তোমাকে বন্দী করে রেখেছে।
কিছুক্ষণ পরে কেনের জ্ঞান ফিরলো।
কতোক্ষণ অজ্ঞান হয়ে ছিলাম কে জানে।
এগুলো অস্ত্র হিসেবে কাজে লাগবে। সঙ্গে কয়েকটা নেওয়া যাক।
এই প্রাণীটার নাম মাকু। ওরা খুব বুদ্ধিমান হয়—আর উপকারী
সবাই মিলে আক্রমণের এক পরিকল্পনা করলো ওরা।
সুড়ঙ্গ দিয়ে আমরা শহরে ঢুকবো। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়বো।

অজানা মহাকাশে
১৩
সুড়ঙ্গের দিকে রওনা হওয়ার আগেই এই ফলগুলো কিছু নেওয়া যাক। কাজে আসবে।
দরজাটা খুলে ফেলছি, তারপর ভিতরে ঢোকা যাবে।
খবরদার…ওটা ছুঁয়ো না।
কিন্তু তখন দেরী হয়ে গেছে…
প্রোটন-ফিল্ড -অবশ করে দেয়। নিশ্চয়ই কোথাও বিপদ ঘন্টি বেজে উঠেছে।
এবার প্রোটন-ফিল্ড অকেজো হয়ে গেছে।
আমরা ঐ খনিতে কাজ করতাম আমাদের কয়েকজন লুকিয়ে ঐ নতুন সুড়ঙ্গটা তৈরী করেছিলো।
সাবধান! লুকোনো ফোটন-বজ্র!
এটাকে পালিশ করে নিলে রশ্মিটাকে উৎসের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া যাবে।

অ্যামেচার রেডিওর রোমাঞ্চ

রত্না ঘোষ

এই তো সেদিনের কথা। ছেলেটা হঠাৎ বায়না ধরেছে 'বিজ্ঞান মেলা' দেখতে যাবে বলে। ছোট্ট সাত বছরের ছেলে। এই বয়েসে বিজ্ঞানের অনেক কিছু জেনে ফেলেছে। যাই হোক ওকে ঠাণ্ডা করতে চলে এলাম বিড়লা মিউজিয়মের বিজ্ঞান মেলায়। গেট দিয়ে ঢোকা-মাত্র দেখতে পেলাম গাছের গায়ে, দেওয়ালে ছড়ানো ছিটোনো কতগুলো হাতে-লেখা পোস্টার।

'Come and visit Amateur station'
'Establish an worldwide Brotherhood
With Amateur activities'
'Be a ham and be happy throughout
your life'

অবশেষে কৌতূহল মেটাতে ঢুকে পড়লাম অ্যামেচার রেডিও স্টেশন ('হ্যাম স্টেশন' নামে পরিচিত)-এর ঘরে। ঢুকে দেখি অদূরেই টেবিলের ওপর কতগুলো ছোট বড় রেডিওর মতন যন্ত্র রাখা আছে। উপস্থিত কিছু আমারই মতন উৎসাহী দর্শক ঘিরে রয়েছে এক ভদ্রলোককে। ভদ্রলোকের হাতে একটি মাইক। হাসি-মুখে উনি অনর্গল কী যে বকে চলেছেন—যার অনেকটাই তখন উদ্ধার করতে পারি নি। পরে অবশ্য তা জেনে নিয়েছিলাম।

ভদ্রলোক বলছিলেন।

Victor uniform figure two romeo seirra
Victor uniform figure two romeo seirra
Victor uniform figure two romeo seirra
Calling cq. on 40 metres/7 megahertz
Calling cq. on 40 metres/7 megahertz
Calling cq. on 40 metres/7 megahertz
And standing by for you.

এরপরই পাশের একটি সেটে সুইচ টিপে শোনা গেল অপর পক্ষের উত্তর। জানা গেল প্রতিপক্ষ যিনি উত্তর দিচ্ছিলেন তিনি কলকাতা থেকে প্রায় হাজার মাইল দূরে ব্যাঙ্গালোর থেকে বলছেন।

Victor uniform figure two romeo seirra
Victor uniform figure two romeo seirra
Victor uniform figure two romeo seirra
This is victor uniform figure two victor tango mike
This is victor uniform figure two victor tango mike.
This is victor uniform figure two victor tango mike.
Standing by for you.

এইভাবেই বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলল পরস্পর দুজনের বেতার বা সহজভাবে বলা যেতে পারে বিনা তারের কথা-বার্তা। জিজ্ঞেস করে জানলাল এরা দুজনেই বেতার বা রেডিও অ্যামেচার (ডাকনাম 'হ্যাম')। এঁরা পৃথিবী-ব্যাপী বেতার যোগাযোগ (wireless communication) বা বেতার সংক্রান্ত গবেষণা ইত্যাদি নিয়ে এতই মেতে থাকেন যে স্নান-খাওয়া পর্যন্ত ভুলে যান। এ এক ধরনের নেশা বা খ্যাপামি। এহেন রেডিও অ্যামেচারদের 'বেতার পাগল' বললে হয়ত কিছু ভুল বলা হবে না। দেশ-বিদেশের বন্ধুদের সঙ্গে 'কলম বন্ধুত্ব' পাতিয়ে তোমরা যে রোমাঞ্চ ও আনন্দ পাও, এই সব রেডিও অ্যামেচাররা তাদের বাড়ীতে বসে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অ্যামেচার বন্ধুদের সঙ্গে বিনা তারে যোগাযোগ করে সেই রকম বা তারও বেশী রোমাঞ্চ ও আনন্দ উপভোগ করেন। এরকমই একজন 'বেতার পাগল'-এর কাছে রেডিও অ্যামেচার সম্বন্ধে যা জেনেছিলাম তা এখানে লিখতে চলেছি।

রেডিও অ্যামেচার সম্বন্ধে কিছু জানবার আগে রেডিও বা বেতারের জন্মলগ্নের একটা ছোট্ট ইতিহাস জেনে নেওয়া দরকার।

সময়টা ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের জেম্‌স্ ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল অঙ্ক কষে বলে দিলেন যে আলোর মতন বিদ্যুৎ শক্তিও তরঙ্গ (waves) আকারে প্রবাহিত হয়। ম্যাক্সওয়েলের এই তত্ত্বকে সে সময় কেউ বিশেষ পাত্তা দিলেন না। বিজ্ঞানী ম্যাক্স-

ওয়েলের মৃত্যু হ'ল ১৮৭৯ খৃস্টাব্দে। মৃত্যুর আট বছর পরে ম্যাক্সওয়েল তত্ত্বের সত্যতা স্বীকৃতি পেল ১৮৮৭ খৃস্টাব্দে—যে বছর জার্মান বিজ্ঞানী হাইনরিখ হার্টজ সর্ব প্রথম বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গ (electro-magnetic waves) তৈরি করতে সক্ষম হ'লেন। পরীক্ষাগারে একটি বিদ্যুতাবেশ যন্ত্র (elctrical induction machine)-এর সুইচ টিপে যে বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গের সৃষ্টি হ'ল তা ঐ ঘরেরই অন্যদিকে রাখা একটি রেজোনেটর (Resonator) যন্ত্রে ধরাও পড়ল। অর্থাৎ হার্টজের এই ইন্‌ডাকটর' ও 'রেজোনেটর' যন্ত্র দুটি বিনা তারে যোগাযোগের প্রথম প্রেরক (Transmitter) এবং গ্রাহক Receiver) যন্ত্র। এরপর কয়েকটা বছর কেটে গেল বেতার গবেষণার বিভিন্ন কাজে। ১৮৯৫ খৃস্টাব্দে এরিয়ালের আবিষ্কার এবং তার সুষ্ঠু প্রয়োগ দেখালেন রাশিয়ান বিজ্ঞানী পোপোভ। সকলে মেনে নিলেন বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গের গতিবিধিকে মাইলব্যাপী ছড়িয়ে দিতে এরিয়ালের আবিষ্কার দরকার ছিল।

সেটা ছিল ১৮৯৪ খৃস্টাব্দের নভেম্বর মাসের একটা দিন। বেতারের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। মাত্র ২০ বছর বয়সের একজন ইটালিয়ান ছাত্র ঐ দিন মধ্যরাতে বোলোগনার কাছে তার বাড়ীর চিলেকোঠায় এক অপূর্ব ঘটনা প্রত্যক্ষ করালেন। সেই রাতের ঐ ঐতিহাসিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে উপস্থিত ছিলেন কেবলমাত্র তার মা। ঘটনাটি হ'ল—বিনা তারে প্রথম সঙ্কেত প্রেরণ। ঘরের একদিকে একটি 'মোর্স কী' (Morse Key) বা সুইচ টেপা হল। পলক না যেতে বারো ফুট দূরে ঘরের অন্যদিকে একটি বৈদ্যুতিক ঘণ্টা বেজে উঠল। ইতিমধ্যে ১৮৩৫ খৃস্টাব্দে আমেরিকার একজন আর্টিস্ট স্যামুয়েল মোর্স 'ডট'-'ড্যাস' সঙ্কেতে খবর পাঠাবার বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ (electrical telegraphy ব্যবস্থার আবিষ্কার করেছিলেন। মোর্স-এর টেলিগ্রাফ ব্যবস্থায় তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু সেইদিন মাঝরাতে বিনা তারে শুধুমাত্র বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গ পাঠিয়ে সঙ্কেত-ব্যবস্থার (wireless telegraphy) আবিষ্কার করে জগৎকে তাক লাগিয়ে দিলেন ইটালির বোলোগনা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ ছাত্র গুগ্‌লিয়েলমো মার্কনি। মার্কনির বেতার আবিষ্কার গোটা পৃথিবীর বিজ্ঞানী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে চাঞ্চল্য এনে দিল। বিজ্ঞানীদের সাথে সাধারণ মানুষও বেতার ব্যবহারে উৎসাহী হয়ে উঠল। বেতার ব্যবহারে উৎসাহী এই সব সাধারণ মানুষদের বলা হতে লাগল রেডিও অ্যামেচার অথবা ,হ্যাম'। এরপর এরিয়ালের (aerial) উচ্চতা বাড়িয়ে সঙ্কেত পাঠাবার দূরত্বসীমা বাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলেন বিভিন্ন অ্যামেচার ও বিজ্ঞানীরা। একই সঙ্গে বেতার সঙ্কেত বা wireless telegraphy-র ব্যবহারিক প্রয়োগও চলতে লাগল সাফল্যের সাথে।

এখানেই কিন্তু বেতারের অগ্রগতি থেমে থাকল না। বিজ্ঞানীরা চিন্তা করতে লাগলেন—মোর্স সঙ্কেত বা 'ডট্‌-ড্যাস' সঙ্কেতই শুধু নয়, কি করে মানুষের প্রকৃত কণ্ঠস্বর বা সঙ্গীত সরাসরি বেতারে পাঠানো যেতে পারে। এরই তাগিদে ১৯০৪ খৃস্টাব্দে আবিষ্কৃত হ'ল 'থারমায়নিক ভালভ্‌'—পরে যার নাম হয়েছিল ডায়োড (Diode)। অধ্যাপক অ্যামব্রোস্‌ ফ্লেমিং ছিলেন এর আবিষ্কর্তা। এটি হ'ল বায়ুশূন্য একটি কাচের নল। যাতে ছিল দুটি মাত্র তড়িৎদ্বার (electrode)—অ্যানোড এবং ক্যাথোড। এর ঠিক দু'বছর পর ১৯০৬ খৃস্টাব্দে আমেরিকার 'লী-দ্য ফরেস্ট' তিন ইলেকট্রোডের 'অডিয়ন' বা ট্রাইয়োড (Triode) ভালভ্‌ আবিষ্কার করলেন। আজ যাকে আমরা ইলেকট্রনিক্স (Electronics) বলি সেই বিরাট বিষয়টির সূত্রপাত হ'ল এই সব থারমায়নিক ভালভ্‌ আবিষ্কারের ফলে। বলা যেতে পারে বেতার টেলিফোন ব্যবস্থা (wireless telephony) এবং 'ব্রডকাস্টিং' ব্যবস্থার অগ্রগতির পথে থারমায়নিক ভালভের আবিষ্কার একটি সার্থক পদক্ষেপ।

সরকারীভাবে বেতারে গান বা কথা প্রেরণ (transmission) বা গ্রহণের (Reception) ব্যবস্থাটাকে এক কথায় ব্রডকাস্টিং ব্যবস্থা বলা যেতে পারে। এই ব্যবস্থায় শিল্পী বা বক্তা স্টুডিওতে যে যন্ত্রের সামনে বসে গান বা কথা বলে তাকে বলে মাইক্রোফোন (Microphone)। এই যন্ত্র-ব্যবস্থা শব্দকে বিদ্যুতে রূপান্তর করে। মাইক্রোফোনের গান বা কথার বিদ্যুৎ তরঙ্গকে চাপিয়ে দেওয়া হয় প্রেরক যন্ত্র (transmitter) থেকে আসা বাহক তরঙ্গের (carrier waves) ওপর। চাপিয়ে দেওয়ার এই কাজটি হয় প্রেরক যন্ত্রের কতগুলি থারমায়নিক ভালভ্‌ ব্যবস্থার সাহায্যে। প্রেরক যন্ত্রের এই তরঙ্গকে উঁচু একটি এরিয়ালের সাহায্যে ছেড়ে দেওয়া হয়। আলোর মতন প্রতি সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল বেগ নিয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এই তরঙ্গ। বায়ু মণ্ডলের আয়ন মণ্ডলে ধাক্কা খেয়ে পৃথিবীর দিকে ফিরে আসা এই তরঙ্গ পৃথিবী পৃষ্ঠের গ্রাহক যন্ত্রে (Radio Receiver) এসে ধরা পড়ে। গ্রাহক যন্ত্রের ইলেকট্রনিক ব্যবস্থার সাহায্যে কথা বা গানের তরঙ্গকে বাহক তরঙ্গ থেকে আলাদা করা (demodulator) এবং ঝিমিয়ে পড়া এই তরঙ্গের শক্তিকে বাড়িয়ে তোলা (amplifier) হয়। পরে গ্রাহক

যন্ত্রের লাউডস্পীকার (Loudspeaker) কথা বা গানের এই বিদ্যুৎ তরঙ্গকে শব্দে রূপান্তরিত করে। মোটামুটি ভাবে এই হ'ল রেডিও ব্রডকাস্টিং ব্যবস্থার বিভিন্ন পর্যায়। নীচের ছবিটিতে পর্যায়গুলোকে একে একে দেখান হ'য় কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে ব্রডকাস্টিং ব্যবস্থাটিকে জানতে ওপরের এই প্যারাটিকে পড়ে আসতে তোমাদের অনেকটা সময় লেগে গেল। অথচ স্টুডিওতে মাইক্রোফোনের সামনে গাওয়া গানকে ব্রডকাস্টিং ব্যবস্থার এতগুলো পর্যায় ডিঙিয়ে তোমার রেডিওর স্পীকারে ধরা দিতে একটুও সময় লাগে না। অর্থাৎ স্টুডিওতে গান গাওয়া চলছে এবং রেডিওতে সেই গানকে শোনা হচ্ছে একই সময়ে, একই সাথে। এর কারণ কি—তা নিশ্চয়ই আর তোমাদের বলে দিতে হবে না।

এইভাবে বিনা তারে বা বেতারে প্রথমে সঙ্কেতে (wireless telegraphy) এবং পরে কথায় (wireless telephony) খবর পাঠাবার ব্যবস্থা যখন সফল হ'তে লাগল, তখন অর্থাৎ বিশ শতকের গোড়ায় পৃথিবীব্যাপী উৎসাহী বেতার অ্যামেচারদের সংখ্যাও বাড়তে লাগল এবং 'বেতার নিয়ে খেলা'র (Ham activities) হ'ল শুরু। রেডিও অ্যামেচার হ'ল এক ধরনের বিজ্ঞান-ভিত্তিক 'শখ' (Scientific hobby)। বলা যেতে পারে পরবর্তীকালে ইলেকট্রনিক বা বেতার কারিগরী বিদ্যার ক্ষেত্রে এইসব রেডিও অ্যামেচারদের অবদান অনেকখানি। কারণ এঁরা এঁদের নানান কৌতূহল মেটাতে, নিজস্ব গ্রাহক বা প্রেরক যন্ত্র তৈরি করতে বা তাদের উৎকর্ষ বাড়িয়ে তুলতে পরীক্ষাগারে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ চালিয়ে যেতেন। এই প্রসঙ্গে রেডিও অ্যামেচার 'পল গড্‌লে'-র নাম করা যেতে পারে। ঘটনাটা ঘটেছিল ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে। পরীক্ষামূলক ভাবে আমেরিকার মোট ২৭টি স্টেশন থেকে শর্ট ওয়েভ বেতার তরঙ্গ ছাড়া হয়েছিল। সুদূর আটলান্টিক থেকে ভেসে আসা সবকটি স্টেশনের তরঙ্গগুলি ধরা পড়েছিল স্কটল্যাণ্ডের পল গড়লের গ্রাহকযন্ত্রে। পল গড়লে নিজস্ব চেষ্টায় এরিয়ালের মান বাড়িয়ে তুলেছিলেন বলেই তাঁর এই সাফল্য। শোনা যায় ইলেক্‌ট্রনিক্‌সে জাপানের এই যে উন্নতি তার পিছনে রেডিও অ্যামেচারদের ভূমিকা প্রায় সবটাই। কোন কারণে সরকারী যোগাযোগ ব্যবস্থাগুলো যখন ভেঙে পড়ে তখনই রেডিও অ্যামেচারদের ডাক পড়ে। জনকল্যাণের কাজেও এঁরা পিছিয়ে নেই। তোমরা হয়ত শুনে থাকবে গত ১৯৬০ সালে দেশব্যাপী এক বিশাল পোস্টাল স্ট্রাইক হয়েছিল ভারতবর্ষে। সে সময় দেশ ও জাতির স্বার্থে সরকারী যোগাযোগ বজায় রাখতে এগিয়ে এসে-ছিলেন বিভিন্ন রেডিও অ্যামেচারেরা। কলকাতায় এই কাজে লিপ্ত ছিলেন এমনই একজন অ্যামেচারের মুখে শুনলাম, সেই সময় এক একজন অ্যামেচারকে সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত একটানা বেতার সংযোগ চালিয়ে যেতে হয়েছিল দিল্লী, বোম্বাই ও মাদ্রাজের সঙ্গে। সেবামূলক কাজে রেডিও অ্যামেচারদের ভূমিকা যে কতখানি তার একটি নজির মেলে ১৯৭৯ সালে অন্ধ্রপ্রদেশের ঝড়ের সময়। দুর্যোগ ও ক্ষয়ক্ষতির খবর দিতে এবং দ্রুত ত্রাণের সাহায্য চাইতে তৎপর হয়ে উঠেছিল রেডিও অ্যামেচারদের হ্যাম স্টেশনগুলো। সম্প্রতি আমাদের দেশে দীর্ঘ ছ' হাজার কিলোমিটারের যে হিমালয়ান মোটর র‍্যালী অনুষ্ঠিত হ'ল তাতে কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে কয়েকজন রেডিও অ্যামেচারকে ডাকা হয়েছিল সংযোগ রক্ষার কাজে। এই লম্বা পাড়ির বিভিন্ন জায়গা থেকে দিল্লীর হেড কোয়ার্টারের সঙ্গে ২৪ ঘণ্টার সকল বেতার যোগাযোগ চালিয়ে গিয়েছিল এইসব রেডিও অ্যামেচাররা।

সেটা ছিল ১৯২২ সাল। wireless বা বেতারের ব্যবহারিক দিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হল ভারত-বর্ষে। শুরু হ'ল খবর পাঠানোর কাজে বেতার ব্যবহারের সরকারী উদ্যোগ। খবর পাঠাতে বেতার টেলিফোনকে কাজে লাগাবার উদ্দেশ্যে ব্যারাকপুর থেকে কলকাতায় বেতার যোগাযোগের একটি মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রসঙ্গে ১৯২২ সালের ১২ই মার্চ তারিখে 'The States-man' পত্রিকায় একটি খবর বেরিয়েছিল। খবরটির কিছুটা অংশ হুবহু নীচে তুলে দেওয়া হ'ল।

"Hello, Hello, The Statesman ! !
Barrackpore Race Course speaking .....
Stand by to receive results of first race
They are at the post···They are off !"
Seated on a camp chair in a motor car besides a Marconi wireless set, a reporter of 'The Statesman' sent messages to the office on Chowringhee yesterday afternoon from the Barrack-pore Race Course just as the first race for the afternoon started.

"হ্যালো, হ্যালো, স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা,
ব্যারাকপুর রেসকোস থেকে বলছি.....

প্রথম ঘোড় দৌড়ের ফলাফল বলা হচ্ছে
দৌড়ের জন্য ঘোড়াগুলো প্রস্তুত.....
এই তারা দৌড়তে শুরু করল।

গতকাল দুপুরে ব্যারাকপুর রেসকোর্সে ঘোড়াদৌড় শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চৌরঙ্গীর পত্রিকা অফিসে ঐ কথাগুলি ভেসে এল বেতারে। ঘটনাস্থলের কাছে একটি মোটর গাড়ীর সীটে বসে 'মার্কনি ওয়ারলেস সেট' থেকে কথাগুলি জানাচ্ছিলেন ঐ পত্রিকার একজন সাংবাদিক। ঐ মহড়ার সাফল্য প্রসঙ্গে ঐ কলমে আরও লেখা ছিল। তা হ'ল ঃ—

The demonstration which was entirely satisfactory in regard both to accuracy and rapid transmission of news, affords striking testimony to the potentialities of both wireless telephony and telegraphy in India.

[সঠিক এবং দ্রুত সংবাদ প্রেরণের ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে সফল ঐ মহড়া বেতার টেলিফোন এবং টেলিগ্রাফ পদ্ধতিকে চালু করার উদ্দেশ্যে ভারতীয় উদ্যোগের একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত] এই সময় থেকে ভারতবর্ষে কিছু বেতার উৎসাহী লোক বা রেডিও অ্যামেচার দেখা দিতে লাগল—যারা বেতার সংকেত বা কথা প্রেরণ বা গ্রহণের কাজ ও সেই সংক্রান্ত নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে মেতে থাকত। কলকাতার ডক্টর শিশির কুমার মিত্র (১৮৯০-১৯৬৩) ছিলেন এমনই একজন রেডিও অ্যামেচার। তৎকালীন সরকার ও রেডিও অ্যামেচারদের যৌথ প্রচেষ্টায় ১৯২৭ সালে কলকাতার বেতার অর্থাৎ 'আকাশবাণী কলকাতার' জন্ম হয়েছিল। ক্রমে এই দেশে অ্যামেচারদের সংখ্যা এত বেড়ে যেতে লাগল যে সরকার থেকে লাইসেন্স দেওয়া শুরু হ'ল। লাইসেন্সের সঙ্গে প্রত্যেক অ্যামেচারকে একটি করে call sign বা পরিচিতি দেওয়ার ব্যবস্থাও শুরু হ'ল। বিশাল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অ্যামেচারদের মধ্যে যোগাযোগ বা পরিচয় ঘটে এই call sign দিয়ে। এই call sign-এর দুটি ভাগ আছে। প্রথম ভাগ অর্থাৎ prefix-টি প্রত্যেক দেশের জন্য নির্দিষ্ট। দ্বিতীয় ভাগটিতে অ্যামেচারদের নিজস্ব পরিচিতি। কয়েকটি দেশের অ্যামেচার call sign-এর prefixগুলো নীচে দেওয়া হল—

ভারতবর্ষ (VU2), নেপাল (QN), পাকিস্তান (AP), শ্রীলঙ্কা (4S), অস্ট্রীয়া (OE), চীন (BY), ফ্রান্স (F), ইংল্যাণ্ড (G), চেকোস্লোভাকিয়া (OK), ডেনমার্ক (OZ) ইত্যাদি।

১৯৩৬ সাল। এই বছর থেকে আমাদের দেশে অ্যামেচার লাইসেন্সের জন্য পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু হ'ল। পরীক্ষায় বসতে হ'লে বেতার তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান, Morse code-টিকে জানা এবং টাইপ-রাইটিং-এর মতন সংকেতে অক্ষর (alphabet) পাঠাতে Morse Key-কে দ্রুত চালনা করার প্র্যাকটিস এবং সর্বোপরি যোগাযোগের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক আইন-কানুনগুলোর মোটামুটি ওয়াকিবহাল হতে হয়। প্রস্তুতির জন্য কিছুদিন কোন Radio Amateur's Club বা কোন Training Institute, -এর সাথে যুক্ত থাকতে হয়। কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত Amateur Radio Club, এমনই এক প্রতিষ্ঠান। সম্প্রতি কলকাতার বিড়লা ইণ্ডাস্ট্রীয়াল এণ্ড টেকনলজিক্যাল

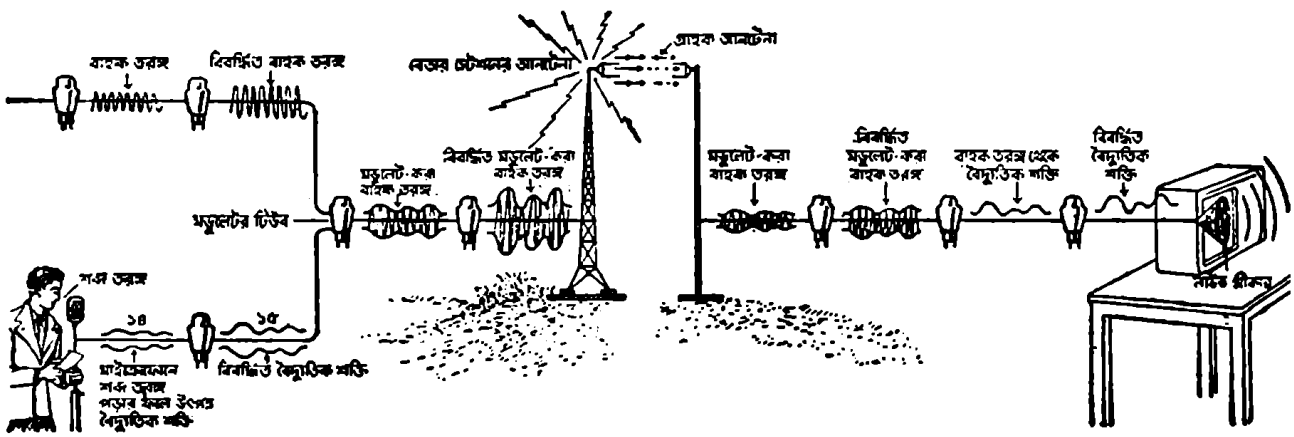

মিউজিয়ম এই ব্যাপারে এগিয়ে এসেছে। রেডিও অ্যামেচার লাইসেন্সের জন্য ট্রেনিং দিতে এখানে একটি 'সেন্টার' গড়ে উঠেছে। জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী লাইসেন্সের কয়েকটি গ্রেড আছে। গ্রেড অনুযায়ী প্রত্যেক লাইসেন্সধারীর আবার বাহক কম্পাংক (carrier frequency) ব্যবহার করার সীমা বেঁধে দেওয়া থাকে। শুধু তাই নয় বেতারের অপব্যবহার যাতে না হয় তার জন্য প্রত্যেক লাইসেন্স -ধারীকে আবার কতগুলো শর্ত মেনে চলতে হয়। যেমন, সংযোগকালে রেডিওর কোন সঙ্গীত, বক্তৃতা বা অন্য কোন অনুষ্ঠানের টেপ রেকর্ড বেতার অ্যামেচার ব্যবহার করতে পারবেন না। দেশের গোপনীয়তা নষ্ট করে এমন কোন রাজনৈতিক কথাবার্তা ; জাতিগত, ধর্মগত, বিভেদ সৃষ্টি করে এমন কোন কথাবার্তা বলা চলবে না। অ্যামেচারদের পরস্পরের সংযোগের ব্যাপারে একটি দেশ অন্য কোন্ কোন্ দেশের সঙ্গে কথা বা সংকেত পাঠাতে পারে বা পারে না এবং কথোপকথনকালে কি কি আইন-কানুন মেনে চলতে হবে—এই সব নির্ণয় করতে International Telecommunication Union (ITU) বলে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। ১৭ই মে —এই প্রতিষ্ঠানের জন্মদিনটিকে World Telecommunication Day বলে ধরে নেওয়া হয়েছে।

এবারে ফিরে আসা যাক বেতার অ্যামেচারেরা কিভাবে পরস্পর যোগাযোগ করতে পারে সেই প্রসঙ্গে। মোর্স সংকেত (Morse code) অথবা সাধারণ কথা-বার্তা (Voice)—এই দু'ভাবে কেবলমাত্র লাইসেন্স আছে এমন অ্যামেচাররা সংযোগ ঘটাতে পারে পরস্পরের মধ্যে। Morse code-এ 'ডট্' (●) এবং 'ড্যাস' (—) এই দুটি চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। 'A' থেকে 'Z' এই ছাব্বিশটি অক্ষর, '0' থেকে '9' এই দশটি অঙ্ক (digit) এবং 'ফুলস্টপ', 'কমা', 'সেমিকোলন' ইত্যাদির প্রত্যেকটির জন্য 'ডট' এবং 'ড্যাসের' এক একটি নির্দিষ্ট বিন্যাসকে আন্তর্জাতিক ভাবে মেনে নেওয়া হয়েছে। যেমন—

Morse Code-এ 'ডট' (...) বিদ্যুতের সময়কাল (time period) $\frac{১}{১৮}$ সেকেণ্ড এবং 'ড্যাস' বিদ্যুতের সময়কাল 'ডট'-এর তিনগুণ অর্থাৎ $\frac{৩}{১৮}$ সেকেণ্ড। 'ডট' এবং 'ড্যাস' নির্দেশিত এই বিদ্যুৎ, ইথারে তরঙ্গ আকারেই থাক (wireless telegraphy) বা তারে প্রবাহ আকারেই (line telegraphy) থাক, একই সঙ্কেত ব্যবস্থা মেনে চলে।

A	• —	V	• • • —
B	— • • •	W	• — —
C	— • — •	X	— • • —
D	— • •	Y	— • — —
E	•	Z	— — • •
F	• • — •	1	• — — — —
G	— — •	2	• • — — —
H	• • • •	3	• • • — —
I	• •	4	• • • • —
J	• — — —	5	• • • • •
K	— • —	6	— • • • •
L	• — • •	7	— — • • •
M	— —	8	— — — • •
N	— •	9	— — — — •
O	— — —	0	— — — — —
P	• — — •	?	• — — • • — — • —
Q	— — • —	?	• • — — • •
R	• — •	:	— — — • • •
S	• • •	;	— • — • — •
T	—	" "	• — • • — •
U	• • —		

বিশাল এই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভাষাও ভিন্ন ভিন্ন। সেই কারণে অ্যামেচারদের পরস্পর কথার সংযোগের (voice) সময় এটি একটি সমস্যা। এই সমস্যা দূর করতে অ্যামেচারদের জন্য একটি আন্তর্জাতিক Q-সংকেত বা Q-signal তৈরি করা হয়েছে। বেতার টেলিগ্রাফ ব্যবস্থায়-ও এই Q-signal মেনে চলা হয়।

Q-সংকেতের তালিকা থেকে কয়েকটি নীচে দেওয়া হ'ল—

CQ—Seek you, general call

QRA—Name of my station/
What is the name of your station ?
QRL—In am busy/
Are you busy ?
QRO—Ir crease power/
Shall I increase power ?
QRQ—Send faster/
Shall I send faster ?
QRS Send more slowly/
Shall I send more slowly ?
QRT—Stop sending/
Shall I stop sending ?
QRV—I am ready/
Are you ready ?
QRX—Call me again/
When will you call me again ?
QSL—I am acknowledging receipt/
Can you acknowledge receipt ?
QTR—Time is...../
What is the enact time ?

এখানে বলে রাখা দরকার অপরপক্ষকে প্রশ্ন করার সময় একই Q-সংকেতের পর একটি প্রশ্ন চিহ্ন (·· — —··) পাঠাতে হয়। আবার কতগুলো ছোট ছোট কথা পাঠাতে কেবলমাত্র আদ্যাক্ষর ব্যবহার করলেই চলে। কোন কথায় কি আদ্যাক্ষর ব্যবহার করতে হবে, তাও থাকে নির্দিষ্ট। যেমন—

AA—ALL After	DE—From.....
AB—ALL Before	CL—Closing the station
AR—End of transmission	PSE—Please
AS—Waiting Period	SRI—Sorry
ABT—About	NM—No more
TU—Tank you	N—No
	C—Yes. ইত্যাদি।

এবার ধরা যাক কোন একজন অ্যামেচার তার সেট-এর সামনে বসে যে কোন একজন অ্যামেচারকে বেতারে ধরবার চেষ্টা করছেন। এক্ষেত্রে উনি Morse সংকেত ব্যবহার করে যে ভাবে শুরু করবেন তার একটা উদাহরণ দেওয়া যা ক—

CQ CQ CQ DE VU2ABC VU2ABC VU2ABC AR

অর্থাৎ কথায় দাঁড়ায়—

calling all stations (CQ) calling all stations (CQ)
calling all stations (CQ) from (DE)
Call sign (VU2ABC) end of message (AR)

এ তো গেল মোর্স সংকেতে যোগাযোগ (Wireless telegraphy) করার রীতি। এবারে আসা যাক (voice) দিয়ে যোগাযোগের ব্যাপারে। তুলনামূলক ভাবে এই ব্যাপারটা কিছুটা সোজা কারণ এখানে মোর্স সংকেত মনে রাখার কোনো ঝামেলা নেই। তবে বেতার যন্ত্রে নানা রকম noise এসে যাওয়ার জন্য কথা কখনও অপরিষ্কার, দুর্বল বা খাটো হয়ে যায়। সেই কারণে কেবলমাত্র call signটিকে কতগুলো নির্দিষ্ট phonetic দিয়ে বলতে হয়। যেমন—

A—ALPHA	N—NOVEMBER
B—BRAVO	O—OSCAR
C—CHARLIE	P—PAPA
D—DELTA	Q—QUEBEC
E—ECHO	R—ROMEO
F—FOXTROT	S—SEIRRA
G—GOLF	T—TANGO
H—HOTEL	U—UNIFORM
I—INDIA	V—VICTOR
J—JULIETT	W—WHISKEY
K—KILO	X—XRAY
L—LIMA	Y—YANKEE
M—MIKE	Z—ZULU

অ্যামেচারদের ব্যবহৃত সংকেতগুলো তোমরা জানলে। এখন নিশ্চয়ই তোমাদের বলে দিতে হবে না Ham Station-এর ঐ ভদ্রলোক মাইকের সামনে কী বলতে চাইছিলেন। সংকেতগুলো মিলিয়ে তোমরাই চেষ্টা করে দেখ না।

কৃত্রিম উপগ্রহকে কাজে লাগাতে অ্যামেচাররাও বসে নেই। কেবলমাত্র রেডিও অ্যামেচারদের নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের জন্য OSCAR (Orbi Hing Satellite Carrying Amateur Radio) বলে একটি কৃত্রিম উপগ্রহকে পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করা হয়েছিল

১৯৬১ সালে। পরবর্তীকালে আরও কয়েকটি Oscar ছাড়া হয়েছে অ্যামেচারদের নিজস্ব চেষ্টায়।

রচনাটি শেষ করার আগে একটি হ্যাম স্টেশনে বা অ্যামেচার স্টেশনে কি কি থাকে তা বলে নেওয়া দরকার। একটি প্রেরক যন্ত্র (transmitter) একটি গ্রাহক যন্ত্র (Receiver) এবং একটি এরিয়াল (aerial) এই তিনটি জিনিস অবশ্যই থাকা দরকার। এগুলি বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। তবে বেশ ব্যয়সাপেক্ষ। অনেক উৎসাহী অ্যামেচাররা আবার নিজেরাও কিছু কিছু বানিয়ে নেয়।

রেডিও অ্যামেচারদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মনে হচ্ছে যেন সব তো বলা হ'ল না। তবে তোমরা এ সম্বন্ধে যদি আর কিছু জানতে চাও তবে অ্যামেচারদের সঙ্গে যোগাযোগ করে দেখতে পার। রেডিও অ্যামেচারদের সম্বন্ধে এতসব জানার পর পুরো ব্যাপারটা তোমাদের কাছে নিশ্চয়ই বেশ অ্যাডভাঞ্চারাস মনে হচ্ছে, তাই না। তবে হ্যাঁ, তড়িঘড়ি এখনই এই নেশার দিকে ঝুঁকো না। কারণ এ বড় মারাত্মক নেশা। খ্যাপামিটা তখন এমনই ঘাড়ে চাপবে যে প্রতিবেশীরা না বলতে শুরু করে 'রেডিও বাবু' বা হয়ত 'বেতার পাগল'!

১৯এ, গুপ্তিপাড়া রোড,
কলিকাতা-১৯

ম্যাজিক বোর্ড

জগদীশ চৌধুরী

A B C E G I J L O Q U W X	D H J K L N O R T U W X Y	E H I M O P Q R T U V W	A C F H K M Q X Y Z U	B C F I J K N O S T V

উপরের ঐ পাঁচটি স্কোয়ার বোর্ড—যাকে আমরা বলছি "ম্যাজিক বোর্ড"। এর সঙ্গে আমার কাছে থাকবে নীচের এই "কী বোর্ড" খানি (Key Board) ঃ—

1=G; 2=D; 3=L; 4=P; 5=E; 6=R; 7=W; 8=Z; 9=A; 10=Y; 11=X; 12=M; 13=Q; 14=H; 15=U; 16=S; 17=B; 18=N; 19=J; 20=V; 21=I; 22=T; 23=O; 24=F, 25=C; 26=K.

এই "কী-বোর্ড" আমি কাউকে দেখাব না, এবং তার কথাও জানতে দেব না।

এবার যাকে খেলা দেখাতে চাই, তাকে যে কোন একটি শব্দ মনে মনে ভাবতে বলব। তারপরে তাকে ঐ উপরের পাঁচটি বর্গ বা বোর্ড দেখিয়ে বলব...প্রথম অক্ষর কোন্ কোন্ বর্গে আছে, দ্বিতীয় অক্ষর কোন্ কোন্ বর্গে আছে...ইত্যাদি সব জানাতে।

সেইগুলি জেনে নিয়ে এবার আমার "কী বোর্ড" দেখে উত্তর বলে দেব।

কয়েকটি উদাহরণ নেওয়া যাক। ধরা যাক, সে ভেবেছে...GO

এখন প্রথম অক্ষর G শুধু ১ম বর্গেই আছে। সুতরাং সে বলবে..."১ম বর্গ।"

এবং O আছে ১ম, ২য়, ৩য় এবং ৫ম বর্গে। সে এই চারটি বর্গের নাম করবে। তখন এই চারটি বর্গের নীচের সংখ্যা...1, 2, 4 এবং 16 যোগ করে পেলাম 23 এবং Key Board বলছে 23 মানে O

অতএব শব্দটি হল...Go.

আরেকটি উদাহরণ...You.

১ম অক্ষর Y আছে...২য় এবং ৪র্থ বর্গে।

২য় অক্ষর O আছে...১ম, ২য়, ৩য় এবং ৫ম বর্গে।

U আছে...১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ বর্গে।

একথা বলতেই, বর্গের নম্বরগুলি যোগ করে পাব, যথাক্রমে...10, 23 এবং 15। এবার Key Board দেখে বলে দেব, শব্দটা হল...You.

সময় লাগবে? ঐটাই তো ম্যাজিসিয়ানের চালাকি, সপ্রতিভভাবে সময় তাকে কাটাতে হবে। বসার ব্যবস্থাও চাই সুন্দর। দর্শকরা সামনে। টেবিলে ঝুলবে ঐ পাঁচ বর্গ বা বোর্ড। পিছনে চেয়ারে ম্যাজিসিয়ান। এবং ঐ Key Board এমনভাবে রাখা, যা শুধু সেই পাবে দেখতে...দর্শকরা নয়।

৬নং চার্চ লেন কলিকাতা-১

ছুঁচো ও কাঁটাচুয়া

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

কীটভুকবর্গ

ছুঁচো, মোল বা কাঁটাচুয়া এই জাতের মধ্যে পড়ে। এদের মুখ সরু, চোখ ছোট। নাক এত লম্বা যে হঠাৎ দেখলে শুঁড় মনে হয়। মাংসাশী জন্তুর মতো এদের সবরকম দাঁতই আছে। সবগুলোই খুব ধারালো। এরাও বানরবর্গের নিকট জ্ঞাতি। এজন্যে করপক্ষবর্গের পরেই এদের স্থান।

এরা মাটিতে গর্ত খুঁড়ে থাকে। সামনের পা দিয়ে মাটি খোঁড়ে বলে ওই দু'পায়ে খুব জোর। নখগুলোও মাটি খোঁড়ার মতো। এরা পোকা-মাকড়, শামুক-ব্যাঙ খায়। কোন কোনটা ফলমূল খেয়ে থাকে।

ছুঁচো বা ছুছুন্দর

পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই ছুঁচো আছে। এশিয়ার এক ভারতবর্ষেই কম করে পনের/ষোল রকম ছুঁচো দেখতে পাওয়া যায়। বাংলাদেশে যে দুরকম সাধারণত চোখে পড়ে, তাদের একদলের রং হয় ঘন ধূসর। অন্য দল প্রায় সাদা। দেখতে অনেকটা ইঁদুরের মতো হলেও, ইঁদুর প্রভৃতি ধারালো দাঁতের প্রাণীর সঙ্গে

ছুঁচো

এদের কোন সম্পর্ক নেই। প্রধান অমিল দাঁতে। ইঁদুর প্রভৃতির কুকুরে-দাঁত নেই। ছুঁচোদের দু'মাড়িতেই কুকুরের মতো দাঁত বেরোয়। ইঁদুরের ছেদন-দাঁত বাটালির মতো ধারালো। বিচনোর দাঁত চ্যাপ্টা। এদের ছেদন আর চিবনোর দাঁত খুব ধারালো।

ছুঁচোর মুখ সরু, নাক লম্বা, চোখে ভালো দেখে না। কিন্তু ঘ্রাণ আর শ্রবণশক্তি খুব বেশি। এদের কোন কোন জাতির শরীরের দু'পাশে দুটো গ্রন্থি থাকে। তা থেকে বিচ্ছিরি গন্ধ বেরোয়। এরা যে জিনিস ছোঁয়, তাও দুর্গন্ধময় হয়ে যায়। পুরুষ ছুঁচো খুব রাগী। স্ত্রীজাতির প্রকৃতি মন্দ নয়। ইংরেজিতে এদের স্রু (Shrew) বা মাস্ক র‍্যাট (Musk Rat) বলে।

মোল

দেখতে ছুঁচোর মতো হলেও মোল (Mole) ও ছুঁচো এক বংশের প্রাণী নয়। উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার কোন কোন জায়গায় মোল জন্মায়। আমাদের দেশে হিমালয়-প্রদেশ, শ্রীহট্ট আর কাছাড়ের পাহাড়িয়া জায়গা ছাড়া আর কোথাও মোল নেই।

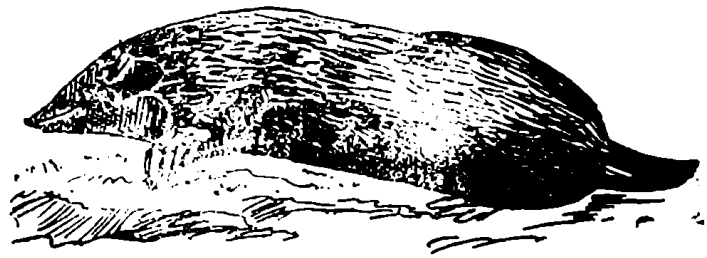

মোল্

এদের চোখ এত ছোট যে, অন্ধকার গর্তের মধ্যে কিছুই প্রায় দেখতে পায় না। এদের ল্যাজ ছোট। ছুঁচোর মতো বড় নয়। গন্ধ আর শব্দ দিয়ে এরা পোকা-মাকড় খুঁজে নেয়। পেলেই সঙ্গীনের মতো ধারালো নখ আর দাঁত দিয়ে তাদের মেরে ফেলে।

কাঁটাচুয়া

ইউরোপের নানা জায়গা আর ভারতবর্ষের সিন্ধু, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যভারত ও মাদ্রাজে কাঁটাচুয়া দেখতে

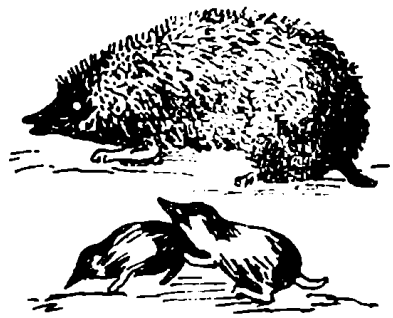

কাঁটাচুয়া

পাওয়া যায়। এদের মাথা, পিঠ ও শরীরের দু'পাশ ছোট ছোট শক্ত কাঁটায় ভরা। এ কাঁটা অস্বাভাবিক অবস্থায় গায়ের সঙ্গে মিশে থাকে। কোন কারণে ভয় পেলে, যখন মাথা ঘুরিয়ে পেটের নিচে নিয়ে বলের মতো পড়ে থাকে, তখন এগুলো খাড়া হয়ে ওঠে। এই কাঁটাই এদের আত্মরক্ষার প্রধান অস্ত্র। এদের ইংরেজী নাম "হেজহগ" (Hedgehog)।

কাঁটাচুয়া পোকা-মাকড়, শামুক-ব্যাঙ, ইঁদুর-সাপ—এইসব খেয়ে বেঁচে থাকে। কেউটে বা গোখরোর মতো বিষধর সাপকেও আক্রমণ করতে ভয় পায় না।

গেছো-ছুঁচো

গেছো-ছুঁচোর (Tree-Shrew) আচার-ব্যবহার অনেকটা কাঠবেড়ালীর মতো হলেও এরা ওই বংশের মধ্যে পড়ে না।

এদের চার/পাঁচটা জাত আছে। দার্জিলিং, সিকিম, আসাম, আরাকান, বার্মা-মালয় প্রভৃতি দেশে এদের দেখতে পাওয়া যায়। তাছাড়া ভারতের দাক্ষিণাত্য, মধ্যপ্রদেশ, ভাগলপুরের কাছাকাছি পার্বত্য-অঞ্চলে একজাতের গেছো-ছুচো (Ellioti) দেখা যায়।

এদের মাথা ও শরীর সাত থেকে আট আর ল্যাজ সাত থেকে ন' ইঞ্চি পর্যন্ত হয়। পিঠের মাঝখানে, ল্যাজের ওপরের রং ঘন লালচে পাটকিলে। পিঠের দু'-পাশের রং ফিকে লালচে পাটকিলে। গলা, বুক, পেট ও ল্যাজের তলা হলদে রংয়ের।

গ্রন্থকারের 'পশুপক্ষী' হইতে পুনমু দ্রিত

ছাত্র-ছাত্রীদের
অপরিহার্য
বই

সম্পূর্ণ পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল

অধ্যাপক ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মার

উচ্চ মাধ্যমিক
রসায়ন

প্রথম খণ্ড : একাদশ শ্রেণী

⊛ প্রচুর গাণিতিক উদাহরণযোগে, নানা রাসায়নিক গণনা সহজবোধ্যভাবে করে দেওয়া আছে। ⊛ অবজেকটিভ ও সাবজেকটিভ উভয় ধরনেরই প্রশ্নের সংকলন (এবং প্রশ্নে তার উত্তর) করা হয়েছে। ⊛ ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্নোত্তরের সাধারণ ত্রুটি ও তার সংশোধন এবং কিছু আদর্শ প্রশ্নোত্তর দিয়ে একটি বিশেষ উপযোগী অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ⊛ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের আদর্শ প্রশ্নগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে, কিছু উত্তর পৃথকভাবে করা হয়েছে। ⊛ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা—জয়েন্ট এন্ট্রান্স, আই. আই. টি—প্রভৃতি পরীক্ষার প্রশ্নগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দি পাইওনীয়ার পাবলিকেশনস ॥ ৮/১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩

ধারাবাহিক উপন্যাস

শার্লক হোমস প্রফেসর চ্যালেঞ্জার এবং মঙ্গলগ্রহ

অদ্রীশ বর্ধন

আগে যা ঘটেছে

অদ্ভুত দর্শন একটা কৃষ্টালের ভেতর দেখা মঙ্গল গ্রহের আশ্চর্য সব দৃশ্য দেখতে পেয়েছিলেন শার্লক হোমস ও এডোয়ার্ড চ্যালেঞ্জার। সেই থেকেই সব ঘটনার শুরু। কৃষ্টালের ভেতর দিয়ে সেইসব আশ্চর্য প্রাণীরা উড়ে এসে পৃথিবীতে এসে পড়ল। বিরাট ঘোড়ার মতো চেহারা—তিন পায়ে হাঁটছে। আর ঘোড়ার ভেতর থেকে অদ্ভুত নীল আলো আর কালো ধোঁয়া বেরিয়ে মানুষজন ঘর বাড়ী সব পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছে। দিশেহারা লণ্ডনের মানুষ আতঙ্ক গ্রস্ত হয়ে প্রাণের দায়ে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ছুটে চলেছে। মঙ্গল গ্রহীরা কি পৃথিবীকে ধ্বংস করতে চায়? বৈদেশিক দপ্তর, সরকারী প্রতিরক্ষা দপ্তর কিছু ভেবে ঠিক করতে পারছেনা।

এই সময়ে টেলিগ্রাম এসে পৌঁছল হোম্‌সের কাছে। বৈদেশিক দপ্তর ও সরকারী তরফের অনুরোধ, দেশের এই ভয়াবহ বিপদের সময় হোম্‌সকেই দায়িত্ব নিতে হবে মঙ্গল গ্রহীদের সঙ্গে মোকাবিলার। সর্বময় কর্তৃত্ব হোম্‌সের। চিঠি নিয়ে এসেছেন, স্যার পার্সি মেসন। কিন্তু সরকারী কামান বন্দুক যেখানে ব্যর্থ সেখানে হোম্‌স কিভাবে মঙ্গলগ্রহীদের প্রতিরোধ করবেন? মাত্র দুটো ঘোড়া এ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে পৃথিবীর বুকে। হিসেব মতো আরও ৮টা আসতে বাকী। হয়তো সেইসব ঘোড়ার মধ্যে কালো ধোঁয়া আর নীল রশ্মিই শুধু নয়, আরও অনেক নতুন মারণাস্ত্র নিয়ে আসবে মঙ্গলগ্রহের প্রাণীরা। মিসেস হাডসন কে গ্রামের বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে লণ্ডনে ফিরে আসছেন শার্লক হোম্‌স। আচমকা একটা ছায়া এসে পড়ল চলন্ত ট্রেনের পাশে। জানালার বাইরে আকাশের পানে তাকালো হোম্‌স। স্থির নিঃশংক তাঁর দৃষ্টি। উড়ুক্কু মেসিন! এটা কি মঙ্গলগ্রহীদের নতুন অস্ত্র?

[নয়]

উড়ুক্কু মেসিন

ঝকঝকে সাদা পিরিচের মত একটা বস্তু উড়ে চলেছে ট্রেনের মাথায়। একবার নক্ষত্রবেগে সামনে ছুটে গিয়েই আবার পেছন দিক দিয়ে উড়ে এসে পুরো ট্রেনটার শেষ থেকে মাথা পর্যন্ত টহল দিয়ে গেল ধীর গতিতে। পরক্ষণেই কক্ষচ্যুত উল্কার মত ছিটকে গেল লণ্ডনের দিকে নিঃশব্দে।

ব্যস, পরের স্টেশনেই ট্রেন গেল দাঁড়িয়ে। ড্রাইভার ঘামতে ঘামতে নেমে এল ইঞ্জিন থেকে। তার ঘরে বউ বাচ্চা আছে। উড়ুক্কু মেশিন যেদিকে গেছে, সেদিকে ট্রেন নিয়ে আর সে যাবে না।

ভয়ের চোটে প্রাণ উড়ে গিয়েছিল বহু তলাণ্টিয়ারেরই। ফিরতি ট্রেনে ওঠবার জন্যে হুড়োহুড়ি শুরু হতেই হাঁটা-পথে লণ্ডন রওনা হল শার্লক হোম্‌স একা।

একদিন একরাত সমানে হেঁটে এবং সামান্যক্ষণের পরিত্যক্ত বাড়ীতে জিরিয়ে নিয়ে লণ্ডন পৌঁছোলো হোম্‌স।

পৌঁছোলো রাত্রে। লণ্ডন তখন খাঁ-খাঁ করছে, মাঝে-মাঝে ধাতুতে-ধাতুতে ঠোকাঠুকির অপার্থিব আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। অপার্থিব তো বটেই—পৃথিবীর কোনো ধাতুতে ওরকম কানফাটানো ঝংকার শোনা যায় না। নিশ্চয় চলন্ত বয়লার সদৃশ তিন পা-ওলা মেশিন টহল দিচ্ছে পথেঘাটে। একবার একটা উঁচু বাড়ীর ছাদের ওদিকে দেখা গেল এমনি একটা মেশিন। প্রায় একশ' ফুট উঁচু। সঙ্গে সঙ্গে একটা ফাঁকা দোকানে ঢুকে গা-ঢাকা দিল হোম্‌স। যতই ডাকাবুকো হোক না কেন—খুনে মঙ্গলগ্রহীদের সঙ্গে চালাকি করতে যাওয়ার মত পরিস্থিতি এখন নয়। নিস্তব্ধ লণ্ডন শহর মাঝে-মাঝে শিউরে উঠছে বাতাস ফালা-ফালা করা স্টীম-সাইরেন জাতীয় ভয়াবহ আওয়াজে। যান্ত্রিক আওয়াজ! লণ্ডন যারা মুঠোয় এনেছে, তাদেরই সংকেত। এক মেশিন আরেক মেশিনকে সংকেতে জানাচ্ছে—সব ঠিক হ্যায়। লণ্ডনের দু'পেয়ে পোকাগুলো চম্পট দিয়েছে হে! রামভীতু সব। দেশটা এখন আমাদের! হাঃ হাঃ হাঃ!

হোম্‌স কল্পনাপ্রবণ নয়। ভাবাবেগকে সে প্রশ্রয় দেয় না। কিন্তু সেইরাতে, আকাশে ঝলন্ত বিবর্ণ চাঁদের ফ্যাকাশে আলোয় নিঝুম নিস্তব্ধ জনহীন পাথরপুরী লণ্ডন শহরের বুকে আততায়ীদের সদর্প বিহার এবং গগণবিদারী উল্লাস-সংকেত শুনে বুকের ভেতরটা মোচড়

দিয়ে উঠল। মনে মনে ভাবল, ওয়াটসন থাকলে এই মুহূর্তে এই শ্মশানপুরীর ভয়াবহতা নিয়ে দুপৃষ্ঠা লিখে ফেলত নিশ্চয়।

ওয়াটসন এখন কোথায়? অন্ধকারে গা ঢেকে বেকার স্ট্রীটের বাসাবাড়ীতে পৌঁছোলো হোমস্। বাড়ী খালি। ম্যান্টলপিসের কাঠে ছুরি দিয়ে গাঁথা ওয়াটসনকে লেখা চিঠিখানা যেমন তেমনি পড়ে আছে।

বেঁচে আছে তো বন্ধুবর?

মনটা ভারি হয়ে এল হোমসের। আলো না জ্বালিয়ে কলতলায় গিয়ে জল পেল স্নান করার। দাঁড়ি কামিয়ে সাবান মেখে স্নান করে এসে বসল মিসেস হাডসনের রান্নাঘরে। শুকনো রুটি আর জল খেয়ে ওপরে উঠতে না উঠতেই টোকা পড়ল সদর দরজায়।

তখন নিশুতি রাত। খট-খট-খট করে কে যেন অতি সন্তর্পণে টোকা মারছে দরজায়।

পা টিপে-টিপে নেমে গেল হোমস্। দরজা খোলাই ছিল। ফাঁক দিয়ে দেখল—হপকিন্স। পুলিশ হপকিন্স। গায়ে শতচ্ছিন্ন কাদা-নোংরা পোশাক। চুল অবিন্যস্ত। দৃষ্টি বিভ্রান্ত।

পাল্লা খুলেই ঝট করে হপকিন্সকে ভেতরে টেনে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল হোমস্।

অস্ফুট চিৎকার করেই সামলে নিল হপকিন্স—"মিস্টার হোমস্, আপনি বেঁচে আছেন?"

"আছি এবং থাকব," অসীম প্রত্যয়ের সঙ্গে বলল হোমস্। "কিন্তু তুমি দরজায় টোকা মারছিলে কেন? সৌজন্য দেখানোর সময় নাকি এখন?"

"অভ্যেস, মিস্টার হোমস্, তাছাড়া মাথার ঠিক নেই আমার। যা দেখে এলাম—বলতে বলতে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল হপকিন্স।

অর্ধো অন্ধকারেই হপকিন্সের মুখচ্ছবি দেখে ব্যাপারটা আঁচ করে নিল হোমস্। নার্ভাস শক।

দেরাজ থেকে ব্র্যাণ্ডির বোতল এনে এক গেলাস খাইয়ে দিল বিধ্বস্ত পুলিশ ইন্সপেক্টরকে...পান করল নিজেও।

তারপর চেয়ারে বসিয়ে বলল..."বলো, কি দেখেছো।"

"দেখেছি ওদের।...কালো-ধোঁয়া, নীল-বিদ্যুৎ, চলন্ত বয়লার, উড়ুক্কু মেশিন।"

"ও সব আমিও দেখেছি, হপকিন্স। কিন্তু তুমি তো দেখছি সমুদ্রপাড়েও গেছিলে।"

চোখ কপালে তুলে হপকিন্স বললে..."আপনি কি করে জানলেন?"

"তোমার জামাকাপড়ে সমুদ্রের ফেনা শুকিয়ে রয়েছে দেখে।"

হ্যাঁ, গেছিলাম মিস্টার হোমস্। তাড়া খেয়ে গেছিলাম। তিনদিক থেকে চলন্ত বয়লারগুলো মানুষগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল পুবদিকে—যেদিকে সমুদ্র। আমি একটা সাইকেল যোগাড় করে প্রাণের ভয়ে সেইদিকেই গেছিলাম। সৈন্যরা যেখানে কামান ছুঁড়েছে, সেখানে ওরা কালো ধোঁয়া ছুঁড়ে দলকে দল খতম করে দিয়েছে। ভীষণ ভারী কালো ধোঁয়া, মিস্টার হোমস্, অনেকটা তরল পদার্থের মত। মানুষ সমান হাইটে মাটির ওপর দিয়ে গড়িয়ে যায়—তারপর ঝুরঝুর করে ঝরে গিয়ে ভুষোর মত মাটি লেপটে থাকে—তখন আর কোনো ক্ষতি হয় না। আমরা পালাচ্ছিলাম বলে কালোধোঁয়া আমাদের দিকে ছোঁড়া হয়নি। পালিয়ে যখন সমুদ্রের পাড়ে পৌঁছোলাম, তখন দেখলাম কতকগুলো জাহাজে পালে পালে লোক উঠছে। দূরে দূরে চলন্ত বয়লারগুলো দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে। কিছু করছে না। মাঝে মাঝে মাথার ওপর দিয়ে নিঃশব্দে সাদা পিরিচের মত উড়ুক্কু মেশিন উড়ে যাচ্ছে। জাহাজ মাত্র কয়েকটা—কিন্তু লোকের শেষ নেই। তার ওপর মূর্তিমান যমদূতের মত চলন্ত বয়লারদের দাঁড়িয়ে থাকা। চেঁচামেচি হট্টগোলের মধ্যে মুরগীঠাসার মত মানুষঠাসা হয়ে দুটোজাহাজ যেই জেটি ছেড়েছে, অমনি তিনটে চলন্ত বয়লার এগিয়ে গিয়েছিল জেটির ওপর দিয়ে জলের ধারে। ঠিক তখনি জেটিতে দাঁড়িয়ে থাকা একটা যুদ্ধ জাহাজ থেকে পর-পর তিনবার কামান দেগে দুটো বয়লারকে টুকরো টুকরো করে উড়িয়ে দিতেই ঘটল বিপর্যয়। চক্ষের নিমেষে মাথার ওপর উড়ে এল একটা উড়ুক্কু মেশিন—কালোধোঁয়া ছড়িয়ে দিয়ে গেল যুদ্ধ জাহাজের ওপর। নিস্তব্ধ হয়ে গেল জাহাজ। একই সঙ্গে জেটি ছেড়ে যাওয়া জাহাজদুটোকে লক্ষ্য করে বার কয়েক নীল বিদ্যুৎ ছুঁড়লো তৃতীয় বয়লারটা। দুটো জাহাজই সঙ্গে সঙ্গে জ্বলতে জ্বলতে ডুবে গেল জলে। মিস্টার হোমস্, ভয়াবহ সেই দৃশ্য দেখে আমি যেন কিরকম হয়ে গেলাম। মাথার মধ্যে সব গোলমাল হয়ে গেল। কিভাবে সাইকেল চালিয়ে হট্টগোলের মধ্যে দিয়ে চলে এলাম, নিজেও ভাল করে জানি না। এইখানে এসে বাঁটের কনস্টেবলদের মত ঐ একশ ফুট উঁচু মেশিনগুলোর চোখ এড়িয়ে বেকার স্ট্রীটে আসতেই আপনার কথা মনে পড়ে গেল। বিপদে-আপদে সব

উড়ুক্কু মেশিনের ছায়া

সময়েই আপনার শরণাপন্ন হয়েছি—মুখে স্বীকার না করলেও আপনার কৃপায় মান যশ পেয়েছি। আর আজ এসেছি শুধু প্রাণটা বাঁচাতে। মিস্টার হোম্‌স্, লণ্ডন তো শেষ—মানুষ জাতটাও কি শেষ হতে চলেছে?"

জলদগম্ভীর স্বরে হোম্‌স্ বললে—না, হপকিন্স, তোমার ছবির মত বর্ণনা থেকেই আমার আগের অনুমানটা সত্যি বলে প্রমাণিত হল। এরা মানুষকে মারতে চায় না—জিইয়ে রাখতে চায়। এক জায়গায় জড়ো করে রাখতে চায়। কেন, সে প্রশ্নের জবাব খুঁজতেই এসেছি আমি লণ্ডনে।" হোমসের প্রত্যয়-কঠিন ধীরস্থির কণ্ঠস্বর আর অসীম আত্মবিশ্বাস সম্বিৎ ফিরিয়ে আনল অস্থির-স্নায়ু হপকিন্সের। হোম্‌স্‌ই তাকে এর পর সাবান দিল, স্নানের জল দিল, খাবার দিল। স্নান করে, খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল হপকিন্স।

তখন ভোরের আলো ফুটছে। বেকার স্ট্রীটে এসে দাঁড়াল হোম্‌স্। গেল উল্টোদিকে ক্যামডেন হাউসে। কর্নেল সিবাস্টিয়ান মোরানের গ্রেপ্তারের পর থেকে এ বাড়ীতে আর ভাড়াটে আসে না। দরজা খোলা। সটান চিলে কোঠায় উঠে গেল হোম্‌স্। দেখল জনহীন লণ্ডননগরীকে। একদা যে নগরীর পথঘাট গমগম করত লোকজন গাড়ী ঘোড়ায়—এখন তা নিস্তব্ধ। কোথাও গাড়ী চলছে না—লোক হাঁটছে না। যেন দুরন্ত প্লেগের আক্রমণে মৃত নগরীতে পরিণত হয়েছে প্রাণচঞ্চল লণ্ডন। রিজেন্ট পার্কের সবুজ গাছগুলো কেবল মাথা তুলে বিষণ্ণভাবে দেখছে বহু বছর ধরে গড়ে ওঠা নিষ্প্রাণ নগরীকে—পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম নগরীকে। এই সেদিনও এর আকাশবাতাস ভারী হয়ে থাকত হাজার হাজার চিমনির ধোঁয়ায়। এখন কেবল চিমনিগুলোই আছে, ধোঁয়া নেই। আকাশবাতাস পরিষ্কার। দু'মাইল দূরে প্রিমরোজ পাহাড়ে ভোরের আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল চকচকে ধাতুতে। টহল দিচ্ছে চলন্ত বয়লার—মঙ্গলগ্রহীদের মেশিন-শান্ত্রী। নেই, নেই, কেউ কোথাও নেই। সৈন্যসামন্ত, রাজা-প্রজা, গেরস্ত-ডাকাত, দ্বিপদ-চতুষ্পদ—সব পালিয়েছে। অথবা মরেছে। লণ্ডন অজেয় লণ্ডন আজ সম্পূর্ণ পরাভূত। লুণ্ঠিত। মৃত।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নেমে এল হোম্‌স্। রাস্তা পেরিয়ে নিঃশব্দ চরণে ঢুকল বেকার স্ট্রীটের বাসায়।

দূরে স্টীম সাইরেনের শব্দে যান্ত্রিক সংকেত শোনা গেল ঠিক সেই সময়ে।

[নয়]

খাঁচায় মানুষ কেন ?

ডোমনিথর্পি থেকে হোম্‌স্ ফিরে আসার আগেই লণ্ডন অঞ্চলে সাতটা চোঙা অবতীর্ণ হয়েছিল, খুব সম্ভব বেস্পতিবার মধ্যরাত্রে পৌঁচেছে অষ্টম সিলিণ্ডার—আগের সাতটার কাছাকাছি তো বটেই। তার মানে আর বাকী রইল মাত্র দুটো। মোট দশটি চোঙার পঞ্চাশজন মঙ্গলগ্রহী একত্র হয়ে অস্ত্রশস্ত্র জড়ো করবার পর কি কাণ্ড শুরু হবে পৃথিবীর বুকে, ভাবতেই গা শিরশির করে উঠল শার্লক হোমসের মত শক্ত ধাতের মানুষেরও। নীল বিদ্যুতের উত্তাপ আর কালোধোঁয়ার ধ্বংসলীলা তো এর মধ্যেই সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে পৃথিবীর বুকে। এর পরেও যদি নয়া হাতিয়ারের আবির্ভাব ঘটে, তাহলে আর রক্ষে নেই।

রেহাই পাওয়া যাবে যদি আততায়ীদের অস্ত্রের আর খাদ্যের ভাণ্ডার শূন্য হয়—মঙ্গলগ্রহের ঘাঁটি থেকে সরবরাহ না এসে পৌঁছোয়।

কিন্তু সে সম্ভাবনা আছে কী? এই হামলার কারণটা যদি সঠিকভাবে জানা যেত, ওদের উদ্দেশ্যটা যদি আঁচ করা যেত—তাহলে সব প্রশ্নেরই সদুত্তর পাওয়া যেত।

দুপুর নাগাদ আড়মোড়া ভেঙে ঘুম থেকে উঠল হপকিন্স। শরীর ঝরঝরে। মাথাও সুস্থ। সমুদ্রতীরে যা কিছু দেখে এসেছে, তার আরও নিখুঁত বর্ণনাও দিতে পারছে।

বললে—"মিস্টার হোম্‌স্, ওরা কিন্তু কালোধোঁয়া দিয়ে ইচ্ছে করলেই সবাইকেই মারতে পারত। মারল না। শুধু যারা ওদের ক্ষতি করেছে, তাদের শেষ করে দিয়েছে। বাকী সবাইকে"—

বলেই থেমে গেল হপকিন্স। চোখের তারায় ফুটে উঠল কুহেলী।

হোম্‌স্ বললে—"থামলে কেন?"

"মিস্টার হোম্‌স্, বাকী সবাই তাড়া খেয়ে যখন এক জায়গায় জড়ো হয়ে বলির পাঁঠার মত কাঁপছে, তখন তাদের মধ্যে থেকে কয়েকজনকে শুঁড়ে করে ধরে খাঁচায় পুরে রাখল।"

"খাঁচায়!"

"হ্যাঁ। চলন্ত বয়লারদের পিঠে বিরাট খাঁচার মধ্যে জ্যান্ত মানুষ অনেক দেখেছি। এই দেখেই সাইকেল চালিয়ে পালিয়ে এসেছিলাম। মিস্টার হোম্‌স্, ওরা মানুষ খাঁচায় রাখছে কেন?"

প্রাণের ভয়ে মানুষ ছুটোছুটি করে উঠছে জাহাজে।

গুম হয়ে রইল হোম্‌স্। তারপর বললে—"খাবার জন্যে নয় তো?"

"খাবার জন্যে! মানুষ কি খাবার?"

"মানুষের কাছে ইতর প্রাণীরা যেমন খাদ্য, ওদের কাছে মানুষের মত ইতর প্রাণীরাও—তেমনি খাদ্য হতে পারে তো!"

"আমরা কি জন্তু!" হপকিন্স যেন বিলক্ষণ অপমানিত।

"শাকসব্জী অথবা ইঁটপাথরও তো নই—জ্যান্ত জীব। সুতরাং....." বাকীটা আর মুখ ফুটে বলল না হোম্‌স্।

রাতের অন্ধকারে শুকনো রুটি ছাড়া আর কিছু খুঁজে পায়নি হোম্‌স, কিন্তু এখন দিনের আলোয় জ্যামজেলি বিস্কুট পেল এন্তার। মিসেস হাডসন সব গুছিয়ে রেখে গেছে শার্লক হোমসের ফিরে আসার কথা ভেবে।

সুতরাং খাওয়াটা মন্দ হল না। হাল্কা মদও পাওয়া গেল খাবার আলমারীতে। মনটা তরতাজা করে দু'জনে বেরুলো রাস্তায়। প্রথমে অবশ্য জানলা দিয়ে মুণ্ডু গলিয়ে দেখে নিল রাস্তায় একশ ফুট লম্বা তালঢ্যাঙা মেট্যাল দানবরা ঘুরছে কিনা। রাস্তার দু'পাশ খাঁ-খাঁ করছে দেখে পেরুলো চৌকাঠ। নিস্তব্ধ পথ পেরিয়ে হাইড পার্কের মধ্যে দিয়ে গেল ফেনসিঙটন গার্ডেনে। একটা লম্বা গাছের মগডাল পর্যন্ত উঠল হপকিন্স। নেমে এসে বললে, মাইল কয়েক দূরে প্রিমরোজ হিলে তিনটে যন্ত্র-দানবকে দেখা যাচ্ছে।

আবার শুরু হল পথ পরিক্রমা। কিছু দূরে একটা নালার পাড়ে এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেল হোম্‌স্। অপলকে চেয়ে রইল নালার পানে।

হপকিন্স দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখল, অদ্ভুত লাল ফুলে ছেয়ে গেছে নালার জল। অনেকটা কুরিপানার মত গড়ন। কিন্তু রঙটা এই সবুজ পৃথিবীর পাতার মত নয়—লাল।

বিড়বিড় করে বললে হোমস্—রক্তরাঙা গ্রহের ফুল মনে হচ্ছে।

সভয়ে অদ্ভুত দর্শন ফুলগুলোর পানে চেয়ে থেকে হপকিন্সও বললে যন্ত্রচালিতের মত—তাই তো মনে হচ্ছে। লণ্ডন শহর চষে ফেলেছি মিস্টার হোমস্। এরম বিকট ফুল তো কোথাও দেখিনি—তাছাড়া রঙটা……।

"হ্যাঁ লাল গ্রহ মঙ্গলের রঙই বটে। হপকিন্স মঙ্গলের প্রাণীরা নিজেদের গ্রহের ফুলফল দিয়ে নতুন বাড়ী সাজাতে আরম্ভ করে দিয়েছে এরই মধ্যেই।"

"যেমন আমরা নতুন বাড়ী সাজাই।"

"হ্যাঁ। কিন্তু…।" হেঁট হল হোমস্। লাল ফুলের কাছে চোখ নিয়ে গিয়ে বললে—কিছু পাতা বাদামী হয়ে এসেছে। ঝরে যাচ্ছে। প্রাণের চিহ্ন মুছে যাচ্ছে—এর মধ্যে! কেন, হপকিন্স, কেন?

বলতে বলতে লম্বা হাত বাড়িয়ে পটাং করে একটা বিবর্ণ পাতা ছিঁড়ে এনে চোখের সামনে মেলে ধরল হোমস্। তারপর পকেট থেকে আতস কাঁচ বার করে খুঁটিয়ে দেখল পাতার শিরা উপশিরা। শেষকালে আতস কাঁচ পকেটস্থ করে বললে চাপা উত্তেজনায়—হপকিন্স আমার অনুমানই ঠিক। পাতাটার মৃত্যু হচ্ছে।

অবাক হয়ে হপকিন্স বললে—কিন্তু এত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন মিস্টার হোমস্? জন্মালে সবাই মরে—

বাঃ, গীতার বাণী মুখস্ত করে ফেলেছো দেখছি। অমর কেউ নয়—ঠিক কথা। জন্মালে মরতেই হবে। কিন্তু হপকিন্স, এত তাড়াতাড়ি কেন? এই তো সেদিন মঙ্গলের প্রাণীরা নেমেছে পৃথিবীতে, সে গ্রহে যে গাছপালা আছে তাদের বীজও ছড়িয়েছে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি তাদের মৃত্যুর কারণটা কি কল্পনাও করতে পারছ না?

ঢোঁক গিলে হপকিন্স বলেন—"আজ্ঞে না।"

"ইডিয়ট," অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে হোম্‌স্—দুই গ্রহের জল হাওয়া দু'রকম। ওখানে যা বাঁচে, এখানে তা মরে। ওখানকার পরিবেশ যাঁদের কাছে স্বাস্থ্যকর, এখানকার পরিবেশ তাদের কাছে অস্বাস্থ্যকর। হে হাঁদারাম হপকিন্স, এই কারণেই ওখানকার ফুল এখানে পটল তুলছে, কে জানে ……কে জানে……"প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে নিরুদ্ধনিশ্বাসে বললে হোম্‌স্—কে জানে মৃত্যুর ছোঁয়া এবার অজেয় মঙ্গলগ্রহীদের কুপোকাৎ করবে কিনা?"

চোয়াল ঝুলে পড়ল হপকিন্সের। সত্যি সত্যিই ঝুলতে লাগল বুকের ওপর। হাঁ হয়ে গেল মুখটা। চিরটাকাল এমনি ভাবে চোখ খোলা রেখে অনেক জটিল রহস্যের সহজ সমাধান দেখিয়ে পুলিশ এবং জনসাধারণের মুণ্ড ঘুরিয়ে দিয়েছে শার্লক হোম্‌স্। এবারও, ভিনগ্রহী দস্যুদের করাল আক্রমণেরও সমাপ্তি সূচনা কি ধ্বনিত হল সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ অপরাধ বিজ্ঞানীর কণ্ঠে?

স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইল হপকিন্স। চোয়ালটা অবশ্য ঝুলতে লাগল আগের মতই।

হোম্‌স্ ততক্ষণে একটা পরিত্যক্ত দোকানে ঢুকে নোট বইয়ের পাতায় পাতায়, খস্‌খস্ করে কি যেন লিখে চলেছে আপন মনে। এক পৃষ্ঠা……দু পৃষ্ঠা……তিন পৃষ্ঠা। লেখা শেষ। পাতা ছিঁড়ে ভাঁজ করে হপকিন্সকে ডাকল হোম্‌স্।

বললে—হপকিন্স, একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তোমাকে দিচ্ছি। এই কাগজ কখানার মধ্যে যা লিখে দিলাম, তা অতিশয় সামরিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বলে জানবে। মিলিটারী দপ্তর এই কাগজের লেখা তথ্যের ভিত্তিতে মঙ্গলগ্রহীদের বিরুদ্ধে রণনীতি নির্ধারণ করতে পারবে। মঙ্গলগ্রহীরা কি খায়, এখনও সঠিক জানা যায় নি। মানুষ খায় কিনা, সেটা পরে প্রমাণিত হবে খন।

ক্রমশঃ

মাটি থেকে আকাশে

পার্থসারথি চক্রবর্তী

ছোটমামা বললেন—এরোপ্লেন মাটি থেকে উপরে উঠতে পারে তার নিজের জোরে। এই শক্তিটা পায় সে এঞ্জিন থেকে। গ্লাইডারে তো আর কোনও এঞ্জিন নেই। গ্লাইডার আকাশে কি করে ভেসে থাকে বলত?

ডিংকু বলল—বাতাসই গ্লাইডারকে আকাশে ঠেলা দিয়ে ওড়ায়।

ছোটমামা বললেন—হ্যাঁ, ঠিকই বলেছে, তবে বাতাসের গতিবেগ যখন উপরমুখী—তখনই গ্লাইডার ডানা মেলে সহজে ভেসে থাকতে পারে। সব জায়গায় বাতাসের এই উপরমুখী বেগ হয় না। কাজেই সে সব জায়গায় গ্লাইডার ওড়ানোও যায় না। আগেই বলেছি, গ্লাইডারে কোনও এঞ্জিন নেই—বাতাসই একে ঠেলা মেরে এগিয়ে নিয়ে যায়। ব্যাপারটা অনেকটা দূরের আকাশে পাখীর ভেসে থাকার মতন। অনেক সময় দেখা যায় খুব উঁচু আকাশে চিল, বাজ, শকুন প্রভৃতি পাখী ডানা দুটোকে শুধু মেলে ধরে মনের সুখে ভেসে বেড়াচ্ছে। তারা ডানা ঝাপটাচ্ছে না। ওপরমুখী দ্রুত প্রবাহিত বাতাসই তাদের ডানা জোড়ায় ঠেলা মেরে উপরে তুলে ভাসিয়ে দেয়। গ্লাইডার ওড়ে এই একই নিয়মে।

গ্লাইডারকে আমরা বলে থাকি এরোপ্লেনের পূর্বপুরুষ। ল্যানচেস্টারের তৈরী গ্লাইডারের মডেলটি ছিল দেখতে ভারী সুন্দর। এখন অবশ্য এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাবার জন্যে আমরা গ্লাইডারকে আর ব্যবহার করি না। কেবল মাত্র হৈ-হুল্লোর স্ফূর্তি আনন্দের জন্য আজকাল গ্লাইডার চেপে আমরা আকাশে উড়ে থাকি। আকাশে ওড়ার বৈজ্ঞানিক কৌশলটাও মানুষ গ্লাইডারে উড়ে বেড়িয়ে তবেই না শিখতে পেরেছে।

গ্লাইডারে চড়ে আকাশে বেড়ানো যেমন মজাদার ঠিক তেমনই রোমাঞ্চকর। এর পাইলটকেও তাই যথেষ্ট দক্ষতা দেখাতে হয় উড়বার এবং ল্যাণ্ডিং-এর সময়। যে ফ্ল্যাট এ্যাংগল থেকে গ্লাইডারকে ছাড়া হয় তাকে বলে গ্লাইডিং এ্যাংগল। সাধারণত এই এ্যাংগল হচ্ছে একের চব্বিশ। অর্থাৎ গ্লাইডার যদি এক মাইল উপরে থাকে (৫,২৮০ ফুট) তাহলে বাতাসে ভেসে এটা চব্বিশ মাইল যেতে পারবে। সাধারণতঃ ফ্লাইং ক্লাবে যে সব গ্লাইডার ব্যবহার করা হয় তাদের স্প্যান (ডানার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত দৈর্ঘ্য) প্রায় পঞ্চাশ ফুট হয়ে থাকে এবং ওজনও বেশী হয় না, চারশো থেকে পাঁচশো পাউণ্ড মাত্র। যে সব গ্লাইডার চমৎকার উড়তে পারে তাদের গ্লাইডিং এ্যাংগল অবশ্য একের ছত্রিশ পর্যন্ত হতে পারে। এখন সখের জন্য যে সমস্ত গ্লাইডার তৈরী করা হয় তাতে এয়ার ব্রেকের ব্যবস্থা থাকে। গ্লাইডারের ডানা, এমন ভাবে তৈরী করা হয় যাতে পাইলট ইচ্ছা মতো দ্রুত প্রবাহিত বাতাসে কণ্ট্রোল করতে পারেন এবং গ্লাইড অথবা ল্যাণ্ডিং করতেও তার সুবিধা হয়।

আজকাল এরোপ্লেনের মতো গ্লাইডারেও অনেক সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি রাখা হয়। কত বেগে গ্লাইডার উড়ে চলেছে তার জন্য এয়ার স্পিড ইনডিকেটর, কত উঁচু দিয়ে গ্লাইডার ভেসে চলেছে তার জন্য অলটিমিটার, দিক নির্ণয়ের জন্য কম্পাস ইত্যাদি গ্লাইডারে থাকে। এসব ছাড়া আরেক রকম যন্ত্র থাকে গ্লাইডারে তার নাম হচ্ছে ভারিওমিটার। এটা থাকলে পাইলট বুঝতে পারে সে আকাশে উপর দিকে উঠছে না নীচে ডুবে যাচ্ছে।

গ্লাইডার অনেক ভাবে আকাশে উড়ানো হয়। একটা এরোপ্লেনের পিছনে নাইলনের শক্ত দড়ি দিয়ে গ্লাইডারকে বেঁধে ওড়ানোই সব চেয়ে নিরাপদ ও সুবিধাজনক।

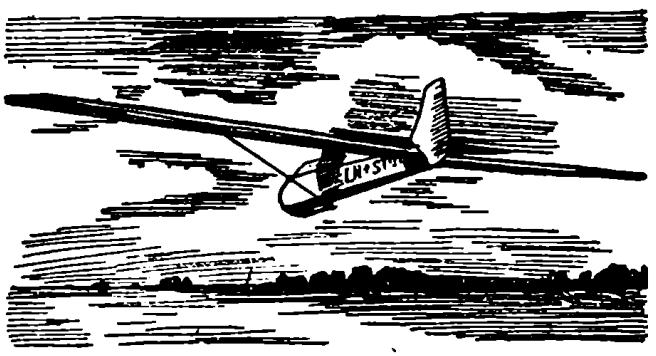

এরোপ্লেনের পিছনে গ্লাইডারকে বেঁধে ওড়ানো হচ্ছে। দেখ, কেমন সুন্দর প্রায় ২০০ থেকে ৩০০ ফুট লম্বা নাইলনের দড়ির সাহায্যে গ্লাইডারকে বেঁধে নিয়ে এরোপ্লেন সামনের দিকে ছুটে চলেছে। এই নিয়মে গ্লাইডারকে আকাশে ওড়ানো খুবই সহজ, নিরাপত্তাও বটে।

এরোপ্লেন গ্লাইডারকে আকাশে তুলে দেওয়ার পর ইচ্ছা করলে এরোপ্লেনের পাইলট অথবা গ্লাইডারের পাইলট ঐ দড়ি সরিয়ে নিতে পারেন। দড়িটা আটকানো হয়

গ্লাইডারের নাকে এবং এরোপ্লেনের লেজে। ঠিক একই রকম ভাবে এরোপ্লেনের বদলে মোটর গাড়ীর পেছনে গ্লাইডারকে বেঁধে, তার পর মোটর গাড়ীকে সামনের দিকে

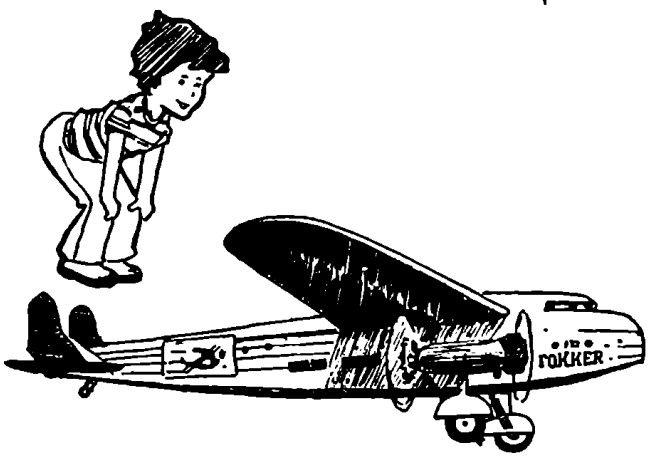

এত ছোট প্লেন দেখে ওরা অবাক হয়ে গেল।

জোরে ছুটিয়েও গ্লাইডারকে আকাশে তোলা যায়। এর জন্য অবশ্য ভাল রান-ওয়ে অর্থাৎ যেখান দিয়ে মোটর গাড়ীটা ছুটবে সেই জায়গাটা ঠিক করে নিতে হবে। দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধেও গ্লাইডারকে নানাভাবে কাজে লাগান হয়েছে।

ক্যালকাটা ফ্লাইং ক্লাবে পৌঁছে ছোটমামা ছেলেমেয়েদের ভিতরে নিয়ে গেলেন।

ওরা তো কোনদিন এত ছোট ছোট প্লেন দেখেনি। কাজেই একই একসঙ্গে নানা ধরনের এরোপ্লেন, হেলিকপ্টার, গ্লাইডার এসব দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেল।

ছোটমামা একটা ছোট্ট এরোপ্লেনের কাছে গিয়ে ওদের প্রথমে এরোপ্লেনের বিভিন্ন অংশের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। এরোপ্লেনের মাথার সামনে থাকে প্রপেলার। ওটা বন্ বন্ করে ঘুরতে থাকে। তার ঠিক পিছনেই থাকে এনজিন। পাইলট যে জায়গাটায় বসে তার নাম হচ্ছে ককপিট। দুটো ডানার কিনারার দুদিকে এলরনস। ডানার একেবারে প্রান্তের দিকে থাকে নেভিগেশন লাইট। পাইলট যেখানে বসেন তার ঠিক মাথার উপর থাকে বেতার যন্ত্র। লেজের দু' পাশে এলিভেটর আর ল্যাজের খাড়া অংশটার নাম রাডার। এনজিনের নীচে এরোপ্লেনের সামনের দিকে যে চাকা থাকে তাকে বলে নোস-হুইল। ডানার দু' পাশে ট্রাই সাইকেলের মতো আরও দুটো চাকা আছে।

এরপর আরও বিস্ময়! ছোট মামা ওদের সবাইকে নিয়ে ঢুকলেন এরোপ্লেনের ককপিটের জায়গায়। পাইলেটের সামনে একটা ডাণ্ডা দেখিয়ে বললেন এর নাম কণ্ট্রোল স্টিক। এটাকে ডাইনে-বাঁয়ে ঘোরানো যায়; তাছাড়া এগিয়ে ও পিছিয়ে আনাও চলে। এই স্টিকের ডান দিকে ও বাঁ দিকে দুটো পেডাল আছে। রাডারের যোগ আছে এই পেডাল দুটোর সাথে।

এইবার ছোটমামা সকলকে নিয়ে মাঠের মধ্যে গিয়ে বসলেন। রামসুক ওদের জন্য আইসক্রীমের কাপ আগেই নিয়ে এসেছিল। ছোটমামা আইসক্রীম খেতে খেতে বলে চললেন ঃ

এরোপ্লেনের প্রপেলারের কাজ হচ্ছে বাতাসকে সামনের দিক থেকে টেনে এনে পিছনে ঠেলে ফেলা। আগেই বলেছি— সাঁতার কাটবার সময় জল সামনে থেকে পিছন দিকে কেটে আমরা এগিয়ে যাই এই একই নিয়মে।

এরোপ্লেনের দু'দিকে দুটো বড় পাখনা রয়েছে। এরোপ্লেনের ডানা বিশেষ ভাবে তৈরী হয়। ডানার উপর দিয়ে জোরে বাতাস বয়, ফলে তার চাপ কমে যায়। ডানার নীচের অংশের বাতাসের চাপ বেশী থাকায় এরোপ্লেন ডানা মেলে সহজেই ভেসে থাকতে

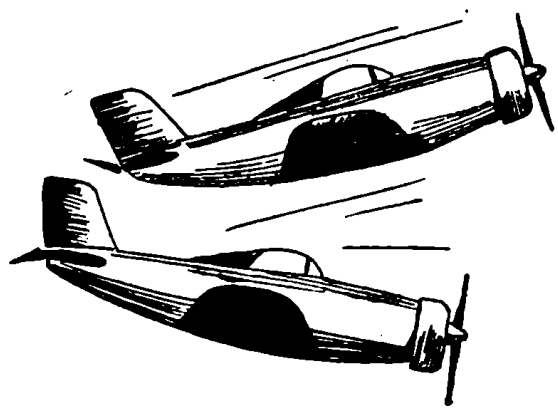

ক্যাপসান—এলিভেটর উঁচু, এলিভেটর নীচু প্রপেলার ঘুরে বাতাসকে পিছনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

পাইলট এলিভেটর কণ্ট্রোল করে খুশীমতো উঁচুতে উঠতে অথবা নীচুতে নামতে পারে। ডানার এলরনস ব্যবহৃত হয় ডান অথবা বাঁ কাত হবার সময় এরোপ্লেনকে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য। রাডার হচ্ছে এরোপ্লেনের হাল, দিক ঠিক রাখবার জন্য এটা দরকার।

পারে। ডানার ইংরাজী নাম—উইং। ডানার এলরনস ছাড়া যে অংশ তাকে বলে এরোফয়েল।

বাবুন বলল ঃ আকাশে তো ওঠা গেল, কিন্তু উঁচুতে ওঠা, নীচে নামা, ডানদিকবাঁদিক ঘোরা ফেরা করা এসব কি করে হয় ?

ছোটমামা বললেন—হ্যাঁ, তার ব্যবস্থাও রয়েছে এরোপ্লেনে। এটা বুঝতে হলে তোমাদের প্লেনের লেজের দিকে মন দিতে হবে। লেজের খাড়াই অংশের নাম রাডার। তার দু'পাশে রয়েছে দুটো এলিভেটর। পাইলট তার খুশী মতো এই এলিভেটরকে উঁচু-নীচু করতে পারে। পাইলট যখন এরোপ্লেনকে উঁচুতে তুলতে চায় তখন সে দু'দিকে এলিভেটরকে উঁচু করে। এর ফলে লেজের দিকটায় হাওয়ার চাপ বেশী পড়ে বলে ওটা ডেবে যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে প্লেনের সামনের দিকটা উঁচু হয়ে উপরে উঠতে থাকে। ব্যাপারটা অনেকটা ঢেঁকিতে পাড় দেবার মতন কাণ্ড আর কি! তোমরা যারা গ্রামে ঢেঁকিতে পাড় দিতে দেখেছ, নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবে ঢেঁকির গোড়ায় পা ফেলে চাপ দিলে তার মুখটা কেমন উপরের দিকে উঠে আসে। আবার প্লেনটা নীচের দিকে নামার সময় পাইলট এলিভেটরকে নামিয়ে দেয়। এর ফলে বাতাস নুইয়ে পড়া এলিভেটরে ধাক্কা দিয়ে তাকে ঠেলে তুলতে চেষ্টা করে। তখন প্লেনের সামনের দিকটা ঝুঁকে পড়ে—প্লেনটা নীচের দিকে নামতে থাকে।

নৌকার হালের মতো এরোপ্লেনেরও হাল আছে। সেটার নাম রাডার। রাডার ওঠা-নামা করে না, এদিক-ওদিক ঘোরানো যায় শুধু। রাডার ডান দিকে ঘোরালে প্লেন ডান দিকে ঘোরে, বাঁদিকে ঘোরালে প্লেনও ঘোরে বাঁদিকে। প্লেনকে ডান দিকে অথবা বাঁ-দিকে ঘুরাবার সময় যেদিকে প্লেনটা ঘুরছে—সেদিকে খানিকটা কাত হয়ে পড়ে। এটাকে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য প্লেনের ডানা দু-টোয় পিছন দিকে এলরনস আছে। এই এলরন দুটো পাইলট তার ইচ্ছা মতো ওঠানামা করাতে পারে। বাঁদিকের এলরন উঠলে ডান দিকেরটা পড়ে আবার ডান দিকেরটা উঠলে বাঁদিকেরটা পড়ে। পাইলট বাঁদিকে প্লেনকে ঘুরাতে চাইলে বাঁদিকের এলরন উঁচু করবে

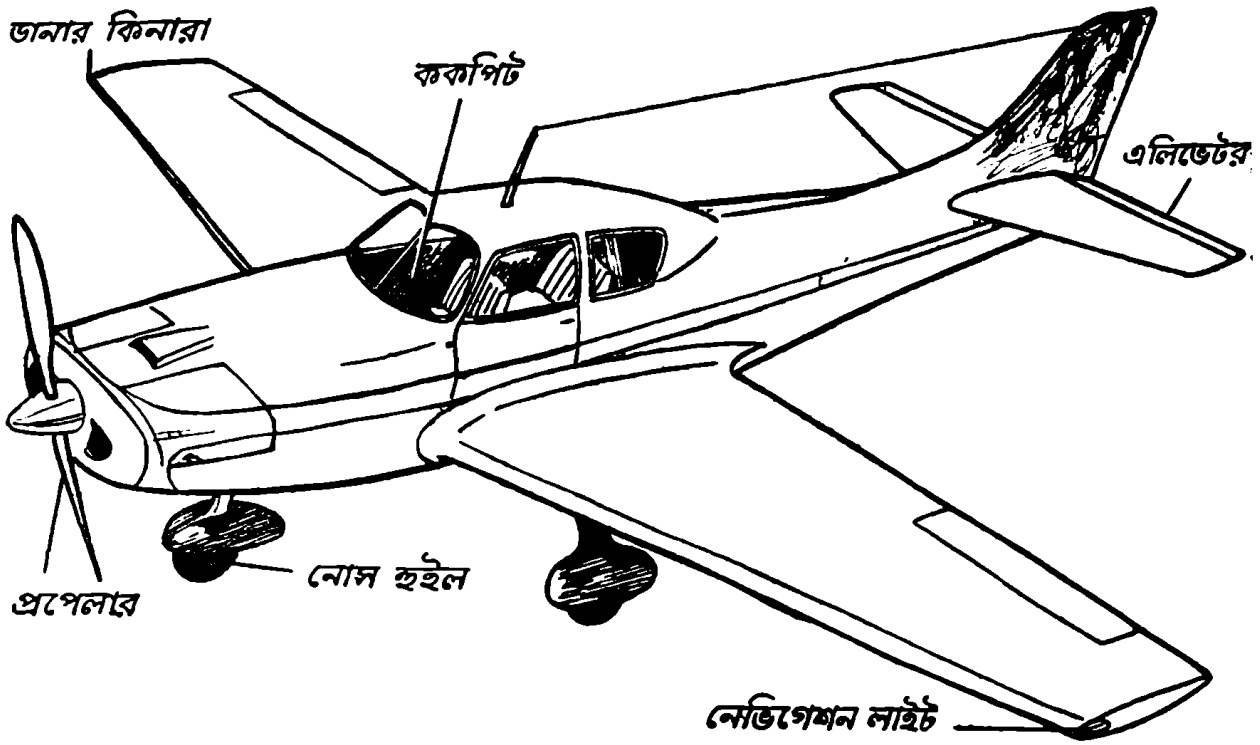

প্রপেলারের তিনটি ব্লেড থাকতে পারে ; কখনও তিনটের বেশীও থাকে। জেট বিমানে কোনও প্রপেলার থাকে না।

প্রপেলার, নোস-হুইল ককপিট, এঞ্জিন, ডানার কিনারা এরোফয়েল বেতারযন্ত্র, ফুসেলেজ, এলিভেটর, রাডার, লিজ, পোর্ট উইং, ডানার পিছনের অংশ ডানার সামনের অংশ, নেভিগেসন লাইট, এরোফয়েলের নীচে ট্রাইসাইকেল চাকা যে সমস্ত উড়োজাহাজের সামনের দিকে দুটো চাকা থাকে তাদের সাধারণত লেজের নীচের দিকে ছোট আর একটা চাকা থাকে।

আর তক্ষুনি ডানদিকের এলরন নীচু হয়ে যাবে। বাঁদিকে এলরন উঁচু হোল বলে এরোপ্লেনের ঐ ডানার বাতাসের চাপ বেশী করে পড়ে। তাই প্লেনের বাঁ দিকের ডানাটা নেমে যায়। সাথে সাথে ডানদিকের এলরন নীচু হয়েছে বলে বাতাসের চাপে ডানদিকের ডানাটা উঁচু হয়ে যায়। মনে রাখবে এলরন ওঠা-নামা করলে প্লেনটা ডান দিকে বা বাঁদিকে কাত হতে পারে। এলরন এক দিকেরটা উঠলে অন্য দিকেরটা পড়ে। দুটো এলরন কিন্তু কখনও একসঙ্গে উঠবে না বা পড়বে না। ঠিক দাড়ি পাল্লায় ওজনের মতন ব্যাপারটা। একদিক ভারী হয়ে নামলে অন্য দিকটা উপরে উঠবে। পাইলট তার নিজের জায়গা অর্থাৎ ককপিটে বসে এইসব পরিচালনা করেন। পাইলটের কন্ট্রোল স্টিকের সাথে এলরনস এলিভেটরের যোগ আছে। রাডার বা প্লেনের হালের যোগ হচ্ছে দুটো পেডালের সাথে। পাইলট পা দিয়ে পেডালকে ঠেলা মারেন। পাইলট ডানদিকের পেডালে ঠেলা মারলে রাডার ডানদিকে ঘুরবে। সঙ্গে সঙ্গে প্লেনের মাথাও ঘুরে যাবে ডান দিকে।

১৯৮২ শিক্ষাবর্ষের জন্য

নতুন সিলেবাসের স্কুলের বই

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের

ইতিহাস

নীরেন সেনের

ভূগোল

তারাচাঁদ নন্দীর

জীবন-বিজ্ঞান

প্রকাশিত হচ্ছে ● নমুনা কপির জন্য লিখুন

দি পাইওনীয়ার পাবলিকেশনস্

৮/১এ, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট কলি-৭৩

রূপোর মূল্য

শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়

একটি বিখ্যাত ফুটবল কাপের ফাইন্যাল খেলা শেষ হল। বিজয়ী দল যখন উজ্জ্বল কাপটি বহন করে আনল, তখন উল্লাসে হর্ষধ্বনি করে উঠল তাদের হাজার হাজার সমর্থক। বিকেলের পড়ন্ত সূর্যের আলো লেগে কাপটি ঝলমল করে উঠল।

ফুটবল নিয়ে তো কতো আলোচনা করো তোমরা, কিন্তু পরম সম্মানের প্রতীক ঐ কাপটি কিসের তৈরী জানো? যে ধাতু দিয়ে এটি প্রস্তুত, একজন বিজ্ঞানীর ভাষায় তার বর্ণনা—'জমাট বাঁধা জ্যোৎস্না'। হ্যাঁ, বিশুদ্ধ রূপোর এমনই রূপ। তবে শুধু রূপ নয়, গুণের জন্যেও পৃথিবীতে রূপোর এতো সমাদর। আধুনিক বিজ্ঞান রূপোর নতুন নতুন গুণের সন্ধান পেয়ে একে কতো কাজে লাগায় তারই একটু পরিচয় দিই।

সোনার তুলনায় দাম কম হলেও রূপোও একটি মূল্যবান ধাতু। 'রূপোর চামচ মুখে দিয়ে জন্মানো' কথার অর্থই হল ধনী পরিবারের সন্তান হিসেবে জন্মগ্রহণ করা। সেকালে বড়লোকেরা রূপোর তৈজসপত্র ব্যবহার করতেন। রূপোর অলঙ্কার তো তোমরা দেখে থাকবে। ছোট্ট সিঁদুর কৌটো, কাজললতা ইত্যাদি তো অনেক বাড়ীতেই আছে। রূপো খুব উজ্জ্বল অথচ নমনীয় বলে একে পিটিয়ে খুব সুক্ষ্ম তার বা পাত তৈরী করা যায়। তা ছাড়া ঢালাই করা রূপোরও সুন্দর সুন্দর কারুকার্যমণ্ডিত মূর্তি তৈরী হত নানা দেশে। এ সব ক্ষেত্রে রূপোর সঙ্গে শতকরা সাত ভাগ তামা মিশিয়ে রূপোকে একটু শক্ত করে নেওয়া হয়ে থাকে।

রূপোতে মরচে বা দাগ ধরে না আর সাধারণ জল বা বাতাসে এর ওপর বিক্রিয়া হয় না। রূপো তাই প্রাচীন কাল থেকে মুদ্রা তৈরীতে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। মুদ্রা তৈরিতে রূপোর ব্যবহার শুরু হয় আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে। খ্রীস্টপূর্ব ৬৪০ সালে এসিয়া মাইনরের লিডিয়া রাজ্যে রূপোর খনি থেকে রূপো নিষ্কাশন করে মুদ্রা তৈরী হত। পরে গ্রীস ও স্পেনেও রূপোর খনি আবিষ্কৃত হয়। আমাদের দেশেও কয়েক বছর আগে পর্যন্ত রূপোর টাকার প্রচলন ছিল।

আধুনিক কালে বিজ্ঞানে এবং প্রযুক্তিবিদ্যায় রূপোর ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে রূপোর একটি বিশেষ গুণের জন্যে। সেটি হচ্ছে বিদ্যুৎ পরিবাহিতা—এ ক্ষেত্রে রূপো অদ্বিতীয়। সেইজন্যে নানারকম বৈদ্যুতিক সংযোজক (কনট্যাক্ট) হিসেবে রূপো ব্যবহৃত হয়। মোটরগাড়ীতে ইনজিন্ চালু করার চাবি ঘোরালে শতকরা দশভাগ ক্যাড্‌মিয়াম ধাতুযুক্ত রূপোর দুটি ছোট্ট সংযোজক পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়। তার ফলে ব্যাটারী থেকে ইঞ্জিনের 'স্পার্কপ্লাগ' পর্যন্ত বিদ্যুৎ প্রবাহ চলতে থাকে আর ইঞ্জিন চালু হয়। আবার চাবি বন্ধ করলে সংযোজকদুটি পৃথক হয়ে গিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ করে দেয়। অমনি ইঞ্জিনও বন্ধ হয়। এই দুটি সংযোজক বছরের পর বছর লক্ষ লক্ষ বার এভাবে কাজ করে যায়। আধুনিক যন্ত্রগণক বা কম্পিউটার তো এখন বিজ্ঞানীদের হাতে আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের আজ্ঞাবহ দৈত্যের মতো। কতো দুরূহ এবং বিচিত্র সব অঙ্ক নিমেষে সমাধান করে, আর বিপুল তথ্যরাশি (Data) বিশ্লেষণ ক'রে সঠিক উত্তর জানায় আধুনিক যন্ত্রগণক। এতেও ছোট ছোট রূপোর সংযোজক ত্রুটিহীনভাবে কাজ করে যায়।

হাড়ের কঠিন শল্যচিকিৎসাতেও রূপোর ব্যবহার আছে। রূপোর তার বা প্লেট দিয়ে হাড় জোড়া দেওয়া হয় বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে। আবার নাক ও চোখের অসুখেও রূপোর যৌগ ব্যবহৃত হয়। সদ্যপ্রসূত শিশুর চোখের সিলভার নাইট্রেটের লঘু দ্রবণ ডাক্তাররা দিয়ে থাকেন চোখের কোনো জীবাণু-সংক্রমণ নিবারণের জন্যে।

রূপো আর দস্তার তৈরী ব্যাটারি একটি চমকপ্রদ আবিষ্কার। এর ওজন কম হলেও খুব কর্মক্ষম এই ব্যাটারি। বিভিন্ন মহাকাশযানে এর ব্যবহার হচ্ছে। নীল আর্মস্ট্রঙের নেতৃত্বে যখন তিন মহাকাশচারী চাঁদে অভিযান করেন তখন সমগ্র যাত্রাপথে তাঁদের অক্সিজেন সরাবরাহ করেছিল মাত্র চার কিলো ওজনের এরকম একটি ব্যাটারি। আর চাঁদের বুকে আর্মস্ট্রঙ ও অলড্রিন যে যন্ত্রশকট ব্যবহার করেছিলেন, সেটিরও ক্ষমতা যুগিয়েছিল অনুরূপ একটি ব্যাটারি। শুধু তাই নয়, মহাকাশচারীদের কথাবার্তা আর চাঁদের রঙ্গীন ছবিও পৃথিবীর টেলিভিশনে পাঠিয়েছিল এই ব্যাটারি। তাহলে অনুমান করা যায় কি রকম শক্তিধর এই ব্যাটারি।

রূপোর নানারকম যৌগ বিভিন্নভাবে আমাদের কাজে লাগছে। নাকের আর চোখের ওষুধের কথা আগেই বলা হয়েছে। আর একটি বিশেষ ক্ষেত্রে রূপার একটি যৌগ বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়—সেটি হচ্ছে ফটোগ্রাফির ফিল্মে। এতে বিশুদ্ধ সিলভার নাইট্রেটের প্রলেপ দেওয়া থাকে। সামান্য পরিমাণ আলো বহুগুণে বর্ধিত

করার বিশেষ ক্ষমতা আছে রূপোর। এক্স-রে ফিল্মেও এই যৌগ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। প্রথম প্রথম যে ফিল্ম তৈরী হয়েছিল প্রায় একশ' বছর আগে, তাতে সিলভার আয়োডাইড অথবা সিলভার ব্রোমাইড ব্যবহার করা হত। এখন আর তা হয় না।

এই তো সেদিন আমেরিকার স্পেস শাট্‌ল 'কলম্বিয়া' মহাকাশে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করার পর আবার নিরাপদে মাটির বুকে ফিরে এসে মহাকাশ বিজ্ঞানে যুগান্তরের সূচনা করল। এই কলম্বিয়ার দু'জন মহাকাশচারী 'ক্রিপেন' আর 'ইয়ং'-এর পানীয় জল পরিশোধনের জন্যে রূপোর একটি যৌগ ব্যবহার করেছিলেন বিজ্ঞানীরা। একটু ব্যয়সাধ্য হলেও রূপোর এই যৌগ সমপরিমাণ ক্লোরিনের চেয়ে হাজার হাজার গুণ শক্তিশালী 'জীবাণুনাশক।

রূপোর ব্যবহার এতো ব্যাপক হলেও পৃথিবীর ভাণ্ডারে সঞ্চিত রূপোর পরিমাণ কিন্তু সীমিত। সেইজন্যে রূপোর মুদ্রার প্রচলন নেই এখন; কারণ আমাদের দেশের সরকার এই মূল্যবান ধাতুটি বিভিন্ন যন্ত্রাংশে এবং নানারকম বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে ব্যবহারের ওপরেই গুরুত্ব দিচ্ছেন। রূপোর আকরিক থেকে বিশুদ্ধ রূপো নিষ্কাশন করা খুব সহজ নয় কারণ আকরিকে রূপোর ভাগ থাকে সামান্য। মাত্র এক কিলোগ্রাম রূপো পেতে হলে প্রায় ১৮০০ কিলোগ্রাম আকরিক পরিশোধন করতে হয়। তামা বা দস্তার আকরিকের সঙ্গেও অনেক সময় সামান্য পরিমাণ রূপো থাকে যা ধাতুমলের সঙ্গে মিশে যায়। রূপোর এতো চাহিদা বলে রূপোর সামান্যতম অংশটুকুও ধাতুমল থেকে উদ্ধার করা হয়। আমাদের দেশে কিন্তু রূপোর আকরিকের সঞ্চয় সামান্য, প্রয়োজনের প্রায় সবটুকুই আমদানী করতে হয়। সেইজন্যে ভারতীয় ভূতত্ত্ববিদ্‌রা নানা জায়গায় এই মূল্যবান ধাতুটির জন্যে অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছেন।

C/o-ডঃ পার্বতী রঞ্জন ব্যানার্জী
(প্রটপ বাগান), পোঃ—বাঁকুড়া, জেলাঃ— বাঁকুড়া

খুদে বৈজ্ঞানিক—দিলীপ দাস

অ্যালার্জী

সুনীত রায়

যে রোগের উৎস সন্ধানে মানুষ আজ পরাজিত, তাই কি বর্তমানে অ্যালার্জী? কি করে হল, কেমন করে হল, প্রশ্ন শুধু প্রশ্নই থেকে যায় আর যদিও বা কিছু উত্তর পাওয়া যায় তা এমনই বিভ্রান্তিকর যা সাধারণ মানুষের কাছে অবোধগম্য। দেহের যে কোন অংশেই অ্যালার্জী হতে পারে। সর্দি, কাসি, মাথাধরা, দেহের ত্বকে একজিমা বা বিছুটি পাতা লেগে ত্বকে লাল লাল চাকা চাকা দাগ, বুকের অ্যাজমা—সবই বিভিন্ন ধরনের অ্যালার্জী। বিভিন্ন গাছপালার পরাগরেণু ও ধুলো শরীরে প্রবেশ করার ফলে এইসব রোগ হতে পারে। অবশ্য, বিশেষ কোনো বস্তুকে বিশেষ রোগের জন্যে দায়ী করা যায় না।

অ্যালার্জী সাধারণত ঋতুপরিবর্তনের ফলে গাছপালার ফলফুলের যে পরিবর্তন দেখা যায়। বিভিন্ন ধরনের খাদ্য যেমন ডিম, চিংড়িমাছ, পুঁইশাক প্রভৃতি ও নানা ধরনের ওষুধের ওপরও অ্যালার্জী নির্ভর করে। আমরা ওষুধ থেকে যে সব অ্যালার্জী দেখতে পাই সে নিয়ে আলোচনা করব। ওষুধ আমরা তখনি খাই, যখন শরীরকে জীবাণুর হাত থেকে রক্ষা করতে সাধারণ প্রাকৃতিক নিরোধক ক্ষমতার গতি ব্যাহত হয়। বর্তমান চিকিৎসাশাস্ত্রের অ্যালোপ্যাথিক ওষুধের সর্বত্রই জয়যাত্রা। যে কোনো রোগের হাত থেকে তাড়াতাড়ি নিরাময় এদের মতো অন্য কোনো ওষুধ পারে বলে মনে হয় না। কিন্তু এ জাতীয় ওষুধ কি রোগ সত্যি সত্যি কমায়—না এক রোগ চেপে দিয়ে আরেকটা রোগের সৃষ্টি করে?

একটু মাথা ধরলেই আমরা মুড়িমুড়কির মতো অ্যাসপিরিন টেবলেট খেয়ে থাকি। কিন্তু, এর পরবর্তী ফল যে কি মারাত্মক তা আমরা একটুও ভেবে দেখি না। সাময়িক মাথার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি এনে দিলেও (Cronic) অম্ল, পিত্ত ও বায়ুর আধিক্য যা পরবর্তী কালে হয়ে যায় সারা জীবনের সঙ্গী। অ্যাসপিরিনে আছে অ্যাসিটিল্‌স্যালিসিলিক অ্যাসিড (Acetylsalicylic Acid) যার মধ্যে বেশীরভাগের কারণ হচ্ছে অ্যাসিটিল্। অবশ্য স্যালিসিলিকও কারোর কারোর কোনো বিশেষ রোগের কারণ হিসেবে দেখা যায়। তাই আসিপিরিনের বদলে তাড়াতাড়ি মাথা ধরা কমাতে প্যারাসিটামোল (Paracetamol) জাতীয় ওষুধ ডাক্তারেরা খেতে বলছেন, কারণ এর পরবর্তী প্রতিক্রিয়া অ্যাসপিরিনের মতো অত মারাত্মক নয়। অ্যাসপিরিন জাতীয় কোনো ট্যাবলেট জিবের ডগায় কিছুক্ষণ রেখে দিলে তা মৃত্যুরও কারণ হতে পারে। অ্যাসপিরিনের সঙ্গে শারীরিক বিক্রিয়ায় অ্যাজমা, সাইনাস শরীরকে অস্বাভাবিক হারে রসিয়ে দেয় ও যখন তখন শরীর থেকে রক্তপাতের সম্ভাবনা দেখা যায়।

অ্যাসপিরিনের স্যালিসিলেট্ থেকে যাদের অ্যালার্জী হয়, তাঁরা ঐ অ্যাসিডের গন্ধ আছে এমন ধরনের খাবার যেমন—স্ট্রবেরী, মদ কমলালেবু, আঙ্গুর, আপেল, চেরীফল ইত্যাদি খেলে কিম্বা লজেন্স, মোমবাতি, দাঁতের মাজন থেকে যদি ঐ ধরনের গন্ধ নাকে একবার গেলেই রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন।

আজকালকার বিভিন্ন দাঁতের মাজনে ফ্লোরাইড ব্যবহার করা হয় যাতে দাঁতকে আরো বেশীদিন সুস্থ রাখা যায়। কিন্তু এই ফ্লোরাইড ব্যবহার করলেই কারোর কারোর মুখ বীভৎসভাবে ফুলে যায়। আবার পারদ, চোখ ও কানের বিভিন্ন ধরনের অসুখের মলম তৈরীতে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু পারদ যাদের সহ্য হয় না, তাঁদের দেহে পারদের কণা প্রবেশ করা মাত্রই গায়ে লাল লাল চাকা চাকা দাগ, মাথার যন্ত্রণা, এমন কি গায়ে ও হাত-পায়ে অসহ্য যন্ত্রণাও দেখা দেয়।

ষাটের দশকের গোড়ায়, অ্যাণ্টিবায়োটিকের ব্যবহার চিকিৎসা জগতে এক আলোড়ন এনে দিয়েছিল। যে কোনো ধরনের রোগ সারাতে টেট্রাসাইক্লিন, এরিথ্রোমাইসিন প্রভৃতি ওষুধ ডাক্তারেরা চোখ কান বুজে ব্যবহার করতেন। কিন্তু দেখা গেল যে এমন কিছু অ্যাণ্টিবায়োটিক আছে যারা দেহে রোগের বিস্তার ঘটাতে সাহায্য করছে। এই ওষুধদের চেমোথেরাপিউটি বলা হয়। অ্যাণ্টিবায়োটিকস্ জাতীয় ওষুধগুলো রোগের উৎপত্তিকারী ব্যাকটিরিয়া-গুলোকে খুব সহজেই মেরে ফেলতে পারে। কিছু এমন কিছু শক্তিশালী ব্যাকটিরিয়া আছে, যাদের কাছে অ্যাণ্টি-বায়োটিকের প্রবল শক্তি গিয়ে পৌঁছতে পারে না— তখনই ওষুধ প্রচুর পরিমাণে খেয়েও রোগ সারতে চায় না। আর ওষুধ খেয়েও যে রোগ সারে না তাই ডাক্তারী ভাষায় অ্যালার্জী নামে পরিচিত। সুতরাং অ্যাণ্টিবায়োটিক যে অ্যালার্জী সৃষ্টি করে না সে ধারনা করাটা ভুল। যদিও দুধরনের অ্যাণ্টিবায়োটিকের মধ্যে প্রথম ধরনের অ্যাণ্টিবায়োটিক গ্রামপজিটিভ ব্যাকটিরিয়া ও দ্বিতীয় ধরনের অণ্টবায়োটিক গ্রাম-নগেটিভ ব্যাকটিরিয়া বংশ

ধ্বংস করতে সাহায্য করে। গ্রাম-পজিটিভ ব্যাকটিরিয়ার মধ্যে স্ট্রেপটোকক্কাস্ গলার ঘায়ের জন্য ও গ্রাম-নেগেটিভ ব্যাকটিরিয়ার মধ্যে নিওমোকক্কাস নিমোনিয়া রোগের জন্যে দায়ী করা যেতে পারে।

স্ট্রেপটোমাইসিন্, নিওমাইসিন্ জাতীয় অ্যান্টিবায়োটিকে শতকরা ৫ থেকে ১০ ভাগ অ্যালার্জী উৎপাদনকারী পদার্থ থাকে। ত্বকের যে কোনো রকম রোগের মলম হিসেবে, ক্রীম ও চোখের ওষুধের জন্যে নিওমাইসিন ব্যবহার করা হয়। কিন্তু, এর থেকে একজিমা দেখা দেয়। সর্দি-কাশি হলেই, টেট্রাসাইক্লিন ব্যবহার করলে খুব তাড়াতাড়ি উপকার পাওয়া যায়। এই ওষুধ আট থেকে দশ বছরের নীচে বাচ্চাকে খাওয়ালে, সাময়িক ও তৎক্ষণাৎ উপকার পাওয়া যায়। এর পরবর্তী ফল পাওয়া যায় বেশ বড় বয়সে। যখন দ্বিতীয় বারে বা স্থায়ী দাঁত উঠে, তখন তার রঙ বর্ণহীন নীলচে বাদামী কিম্বা বাদামী রঙের হয়। তখন, আর কোনো উপায়েই দাঁতের স্বাভাবিক রঙ ফিরিয়ে আনা যায় না। পেনিসিলিনে যাদের অ্যালার্জী হয় তাদের সেফালোসিন্ খেতে বলা হয়। এই সেফালোসিনও বেশী খেলে রক্ত কোষের সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে হ্রাস পেতে থাকে। উপকারী অ্যান্টিবায়োটিক হিসেবে এরিথ্রোমাইসিন বিশেষভাবে পরিচিত হলেও, কারোর ক্ষেত্রে জণ্ডিস ও কলেরা রোগের কারণ হিসেবে এই ওষুধের ভূমিকা দেখতে পাওয়া যায়।

অনেকেই নিশ্চয় ভাবেন যে অ্যান্টিবায়োটিকের কোর্সটা পুরো শেষ করতে বলা হয় কেন? যখন কোনো রোগে, অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার প্রথম দুদিনের মধ্যে যদি কোনো উপকার না হয়, তখন রক্ত পরীক্ষা করলে দেখা যায়, রোগী সম্ভবত ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন। কারণ, ভাইরাসের ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক মোটামুটি কোনো কাজ করতে পারে না বলেই ধারণা করা হয়। কিন্তু দু-এক দিনের মধ্যে রোগের প্রকোপ কমে গেলে, ওষুধ খাওয়া বন্ধ করলেই, তা আবার দ্বিগুণ আকারে বেড়ে যায়। কারণ ঐ দু-একদিনের মধ্যে অ্যান্টিবয়োটিক্স জাতীয় ওষুধগুলো প্রায় সমস্ত ব্যাকটিরিয়াকে মেরে ফেলে। কিন্তু তাদের মধ্যে কিছু শক্তিশালী ব্যাকটিরিয়া তখনো মরে না, তাই পুরো কোর্স শেষ করলে, ব্যাকটিরিয়ার বংশ সম্পূর্ণভাবে নির্মূল হয়ে গিয়ে রোগের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। অন্যথা দ্বিগুণ হারে ঐ কয়েকটি জীবিত ব্যাকটিরিয়ার বংশ বৃদ্ধি, রোগের আকার ভয়াবহ রূপ নিতে সাহায্য করে।

সূর্যের আলো আর ওষুধের বিক্রিয়ায় দেহের চামড়ায় লাল লাল পাড়া দাগ দেখা যায়। একে 'সান বার্ন বলে। এই 'সান বার্ণ' অনেক সময় চুলের ময়লা পরিষ্কার করতে শ্যাম্পু ব্যবহার করলেও হয়। তখন তাকে সোলার ডারমেটিটিস্ (Solar Darmatitis) বলে। অ্যাসপিরিন, অ্যান্টিবায়োটিক্স—পেনিসিলিন-সালফোনামাইংস, টেট্রাসাই -ক্লিন, ইনস্যুলিন হরমোন, কেনোপফেলীন, মরফিন, কোডিন, অ্যালকাহোল প্রভৃতি বহু ওষুধ থেকে অ্যালার্জী হয়। অনেক ওষুধ আছে যেগুলো খাওয়া মাত্রই, তার বিষক্রিয়া শুরু হয়ে যায় আবার কিছু ওষুধ আছে যেগুলো খাওয়ার সাত আট দিন পরে তার বিপরীত ফল প্রকাশ পায়। পেনিসিলিন ছ'দিন নেওয়ার পর নবম দিনে এর বিক্রিয়া শুরু হয়, অবশ্য তিনদিনের বেশী পেনিসিলিন ব্যবহার করার নিয়ম নেই।

দেহের বিভিন্ন অংশে জ্বালা-যন্ত্রণা, চামড়ার ওপরে লাল লাল দাগ প্রভৃতি অ্যালার্জী যখন ভয়াবহ আকার ধারণ করে, তখন করটিসোন বা স্টেরয়েড জাতীয় হরমোন ওষুধ ব্যবহার করা হয়। এদের ব্যবহারের ফলে সাময়িক উপকার পাওয়া যেতে পারে কিন্তু ব্যবহারের পরিমাণ আস্তে আস্তে না কমালে, রোগটি এমন এক ভয়াবহ রূপ নেয় যাকে সারানো খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

অহেতুক উত্তেজনা, ঝিমিয়ে পড়া, সামান্য ঘটনাকে বিশালভাবে চিন্তা করার প্রবণতা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের উপসর্গ অ্যালার্জী রোগাক্রান্ত রোগীর মধ্যে দেখা যায়। একজিমা, অ্যাজমা এরা রাতের ঘুম কেড়ে নিয়ে রোগীকে চিন্তান্বিত করে তোলে।

অনেকের মনেই একটা প্রশ্ন জেগেছে, আজ থেকে ত্রিশ-চল্লিশ বছর পূর্বেও তো এতো অ্যালার্জী ছিল না কিন্তু বর্তমানে এই রোগের শতকরা হার ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। ঘরের তাপমাত্রা 18°c—20°c-এর কম হয়ে গেলেই অ্যালার্জী দেখা যায়। খাদ্যে ভিটামিনের পরিমাণ কমিয়ে সারের সাহায্যে আয়তন বৃদ্ধি করা হচ্ছে, প্রোটিনের পরিমাণ কমে যাচ্ছে, এবং পরিবেশের যে ভয়াবহ দূষণ—এসবই অ্যালার্জীর অস্বাভাবিক বৃদ্ধির প্রধান কারণ।

বর্তমানে সভ্যতার অগ্রগতি ও বিজ্ঞানের সাফল্যের সাথে সাথে নিত্য নতুন বহু ওষুধ আবিষ্কৃত হচ্ছে। যে কোনো ওষুধ তৈরী হচ্ছে কোনো একটি বিশেষ রোগের কথা চিন্তা করে—কিন্তু দেহের সার্বিক উন্নতিতে এরা সম্পূর্ণ ব্যর্থ। একটা রোগ কমাতে গিয়ে আর একটা নতুন রোগের সৃষ্টি করলে সামাজিক মূল্যায়নে, সে ওষুধের সার্থকতা কোথায়? ওষুধের এই ভয়াবহ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা চিন্তা করলে শিহরণ জাগে, অ্যালার্জীর কথা ভাবলে ভয় হয়—জানি না এর শেষ কোথায়?

---

৭০১ ডায়মণ্ড হারবার রোড, কলি-৩

● তোমরা যারা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিয়মিত পাঠক এবং স্কুলে পড়াশোনা করছ—'ছোটদের দপ্তরে' লেখা পাঠাতে পার। সম্পাদক মণ্ডলীর মনোনয়ন পেলে সে লেখা 'ছোটদের দপ্তরে' ছাপা হবে। তবে শব্দ সংখ্যা কিছুতেই যেন ২০০-র বেশী না হয়। সংগে প্রয়োজন মতো ফটো বা আঁকা ছবি পাঠাবে।

● এবার থেকে ছোটদেব দপ্তরেই 'বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা' প্রকাশিত হবে। উত্তর বা সমাধান ছাপা হবে পরবর্তী সংখ্যায়। তোমরাও এর উত্তর পাঠাতে পার। উত্তরদাতাদের মধ্যে প্রথম দশজনের নাম পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে।

ছোটদের দপ্তর

● শুধু আমাদের প্রশ্নই নয়, তোমরাও ছোটদের দপ্তরে প্রশ্ন পাঠাতে পার জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রশ্ন, পড়াশোনার প্রশ্ন, যার উত্তর আমরা পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে প্রকাশ করব।

তবে সব ক্ষেত্রেই চিঠি বা খামের উপরে 'ছোটদের দপ্তর' কথাটি উল্লেখ করতে হবে।

জয়ন্ত দত্ত, পরিচালক,
ছোটদের দপ্তর,

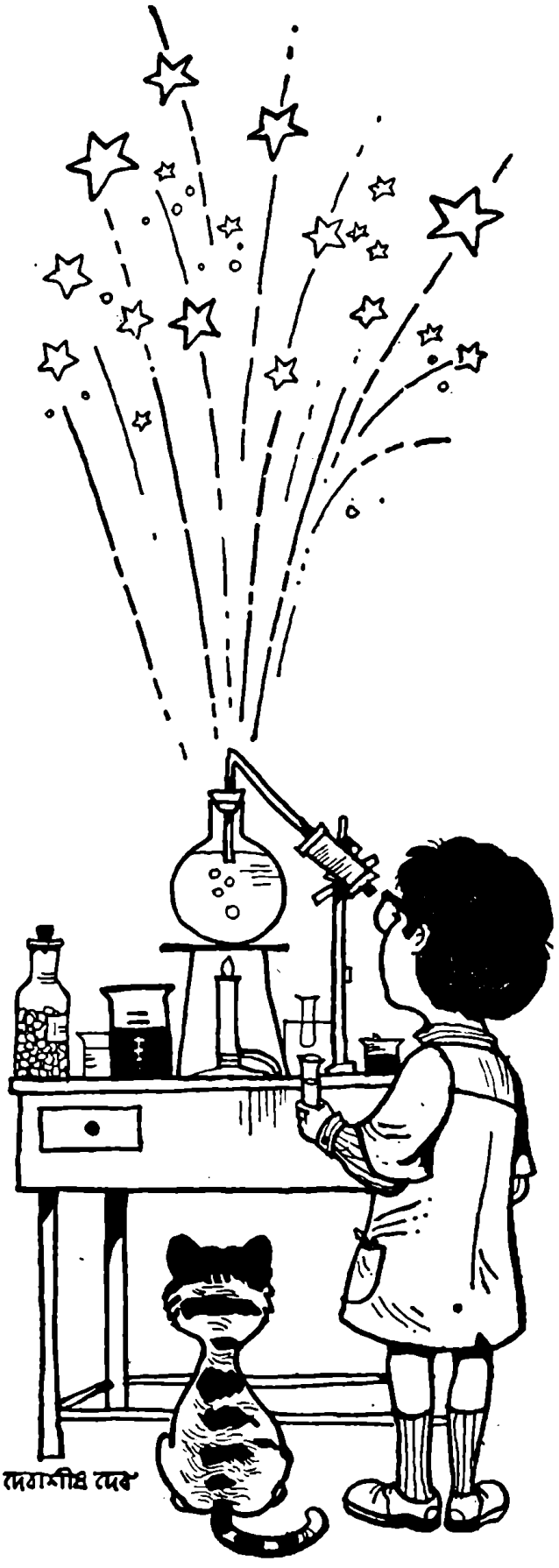

বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা

শ্রীবৈজ্ঞানিক

১। —273°c উষ্ণতাকে কি নামে অভিহিত করা হয় ?

২। মানুষের চোখে কি রকম লেন্স থাকে ?

৩। ব্লিচিং পাউডারের রাসায়নিক নাম কি ?

৪। সাধারণ লবণ ও কেরোসিনের মধ্যে তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোন্‌টি ?

৫। একটি ঘনকের আয়তন 64 c. c.। ঘনকটির একটি তলের দৈর্ঘ্য কতো ?

৬। দুধের ঘনত্ব মেপে তার বিশুদ্ধতা যাচাই করার জন্যে কোন্ যন্ত্র ব্যবহার করা হয় ?

৭। জলের বাষ্পীভবনের লীন তাপের মান কতো ?

৮। 'ক্যালামাইন' যৌগটির রাসায়নিক সংকেত কি ?

৯। 1650 খ্রীস্টাব্দে প্রথম বায়ু-পাম্প আবিষ্কার করেন কে ?

১০। পৃথিবীর ব্যাস অপেক্ষা 'নেপচুন'-এর ব্যাস কতোগুণ বেশী ?

১১। 'রাডার' যন্ত্রের আবিষ্কর্তা কে ?

১২। একটি মূলহীন উদ্ভিদের নাম বল।

১৩। প্যাংক্রিয়াস বা অগ্ন্যাশয় হ'তে যে উত্তেজক রস নিঃসৃত হয়, তার নাম কি ?

১৪। 'প্রস্টা গ্ল্যাণ্ডন' জিনিসটা কি ?

১৫। মানুষের দেহের দীর্ঘতম হাড় কোন্‌টি ?

(উত্তর থাকবে পরবর্তী সংখ্যায়)

সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্যে প্রথম দশজনের নাম পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে।

(গত সেপ্টেম্বর মাসের সমাধান)

১। রাডন (Radan) নামক তেজস্ক্রিয় বিরল গ্যাস সর্বাপেক্ষা ভারী মৌলিক গ্যাস।

২। 'অ্যাডিনোসিন ট্রাই ফসফেট'-এর সংক্ষিপ্ত নাম ATP.

৩। ভিটামিন বি-12 এ কোবাল্ট থাকে।

৪। 'ড্রাই-আইস' হলো কঠিন কার্বন ডাই অক্সাইড।

৫। 1669 খ্রীস্টাব্দে জার্মান কিমিয়াবিদ ব্র্যাণ্ড (Brandt) মূত্র থেকে ফসফরাস নামক মৌলিক পদার্থটি নিষ্কাশন করেন।

৬। ডি-অক্সি রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিডের সংক্ষিপ্ত নাম DNA

৭। পারমাণবিক চুল্লীতে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয় ইউরেনিয়াম।

৮। বায়ু, জল ও ইস্পাত মাধ্যমের মধ্যে ইস্পাতে শব্দের গতিবেগ সর্বাধিক।

৯। M. K. S. পদ্ধতিতে বলের এককের নাম 'নিউটন'।

১০। স্কটল্যাণ্ডবাসী প্রযুক্তিবিদ্ জেমস্ ওয়াট 'অশ্ব শক্তি' (হর্স পাওয়ার) নামটি প্রথম ব্যবহার করেন।

১১। পিতল, বিসমাথ ও অ্যাণ্টিমনি গলনের ফলে তরলে পরিণত হ'লে আয়তনে সঙ্কুচিত হয়।

১২। যে সব মৌলিক কণা 'বসু সংখ্যায়ন' মেনে চলে তাদের 'বোসন' বলে।

১৩। সুন্দরী, গরাণ ও কেওড়া প্রভৃতি উদ্ভিদের শ্বাসমূল আছে।

১৪। তাপ প্রয়োগ করলে কার্বনের রোধ হ্রাস পায়।

১৫। 'পেনিসিলিয়াম নোটেটাম' নামক ভেষজ উদ্ভিদ থেকে স্যার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং পেনিসিলিন আবিষ্কার করেছিলেন।

প্রশ্নোত্তর

অতনু চ্যাটার্জী, হাওড়া ॥ প্রঃ—টর্চের ব্যাটারি ফুরিয়ে গেলে তা রোদে দিয়ে বা চার্জ করে কি পুনরায় কার্যোপযোগী করা সম্ভব?

উঃ—না। তার কারণ টর্চে আমরা যে ব্যাটারি ব্যবহার থাকি তা নির্জলা কোষ। এই কোষে যে সব রাসায়নিক বিক্রিয়া করে বিভব প্রভেদ তৈরী করে, সে-সব বিক্রিয়া একমুখী (irreversible reaction)। তবে অনেক সময় তাপ প্রয়োগে সামান্য অয়নন (Ionisation) ঘটে কিছু বিভব প্রভেদ তৈরী হতে পারে—কিন্তু তা কাজের উপযোগী নয়।

অমিতাভ শীল, হাওড়া ॥ প্রঃ—ভোরবেলা আকাশের উত্তর-পশ্চিম অংশে চলমান একটি সাদা গোলাকার বস্তু সেপ্টেম্বর মাসে বেশ কয়েকদিনই দেখতে পেয়েছি। এটা কি কৃত্রিম উপগ্রহ? না রকেটের জ্বলে যাওয়া ধ্বংসাবশেষ?

উঃ—সম্ভবত দুটোর কোনটাই নয়। হয়তো কোন জেট-প্লেন হতে পারে।

প্রদীপ্ত সরকার, হুগলী ॥ প্রঃ—আমি কয়েকটি গল্প লিখিয়াছি। আপনাদের পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠাতে চাই। আমি কি গল্প পাঠাতে পারিব?

উঃ—তোমার চিঠির উত্তর তো এবারে ছোটদের দপ্তরেই প্রকাশ করা হয়েছে।

সুস্মিত মাইতি, শিবপুর, হাওড়া ॥ প্রঃ—রসায়নের সহজপাঠ এর লেখক মহাশয়ের কাছে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করছি। ছাত্র হিসাবে তাঁর কাছে আমার আবদার 'জৈব যৌগের' নামকরণ ও শ্রেণী বিভাগ নিয়ে তিনি যদি একটু আলোচনা করেন তা হলে আমরা খুবই উপকৃত হব।

উঃ—তোমার বক্তব্য লেখক শ্রীঅমর নাথ রায়কে জানানো হয়েছে।

শিবপ্রসাদ কীর্তনীয়া, উড়িষ্যা ॥ প্রঃ—ভয়জার ২ এখন শনি ঘুরে ইউরেনাসের দিকে ছুটে চলছে। এতে কি জ্বালানি আছে? এবং রকেট দ্বারা চলছে? কত বড় রকেট লাগানো আছে যা দু-বছরেও শেষ হয় নি?

উঃ—শারদ সংখ্যা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রকাশিত 'মানুষ ও মহাকাশ' প্রবন্ধে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সার্বজনীন পূজোয় বিজ্ঞান সেমিনার

নলিনীরঞ্জন স্ট্রীট সার্বজনীন দুর্গাপূজা উপলক্ষে দি সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ্ বেঙ্গল এক নতুন ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করে। সার্বজনীন পূজার পঞ্চমীর দিন মা দুর্গার আবরণ উন্মোচন উপলক্ষে এই সংস্থা ঐ দুর্গাপূজা কমিটির সভ্যদের নিয়ে 'পরিবেশ ও আমরা' এই পর্যায়ে একটি বিজ্ঞান সেমিনার আয়োজন করে। উক্ত আলোচনা সভায় ডক্টর ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা পরিবেশ দূষণের বিভিন্ন দিক এবং তরুণদের এ ব্যাপারে কি ভূমিকা হতে পারে এ নিয়ে এক দীর্ঘ আলোচনা করেন। দি সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন্ অফ্ বেঙ্গলের সম্পাদক শ্রীপুব্রত রায়চৌধুরী উৎসব কমিটিকে গঠনমূলক ও সমাজভিত্তিক কাজে এগিয়ে আসবার জন্য আহ্বান জানান। তিনি বলেন, উৎসবে অযথা হাজার হাজার টাকা অপব্যয় না করে সে-টাকা দিয়ে পূজা সংস্থা বিজ্ঞানভিত্তিক কর্মসূচী হাতে নিতে পারে প্রয়োজন হলে বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক সংস্থাকে সাহায্য করতে পারেন।

অনুষ্ঠান মা দুর্গার আবরণ উন্মোচন করেন সমাজসেবী ডঃ গোপা মুখার্জী। শ্রীসুনীত রায় জল দূষণ নিয়ে আলোচনা করেন। এই দুর্গাপূজা সংস্থা এ ধরনের সেমিনার আয়োজন করে ধন্য হয়েছে এবং আগামী বছর পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে এই দুর্গাপূজা কমিটি একটি 'বিজ্ঞান প্রদর্শনী' ও বিভিন্ন রকমের বিজ্ঞানভিত্তিক কর্মসূচী গ্রহণ করবার জন্য দি সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ্ বেঙ্গলকে অনুরোধ জানান।

(নিজস্ব প্রতিবেদক)

পেট্রোলিয়ামের ইতিবৃত্ত

সুদীপ্ত দাশগুপ্ত (১১)

আধুনিক সভ্যতা বিকাশের ক্ষেত্রে পেট্রোলিয়মের দান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে পেট্রোলিয়ম সবচেয়ে বেশী উৎপাদন হয় এমন চারটি অঞ্চল রয়েছে। প্রথম অঞ্চলে রয়েছে কলম্বিয়া, ক্যালিফোর্নিয়া, মেক্সিকো, ভেনেজুয়েলা এবং পেরু। দ্বিতীয় অঞ্চলে রয়েছে ইরান, ইরাক মিশর (ইজিপ্ট) রাশিয়া এবং রুমানিয়া। তৃতীয় অঞ্চলে রয়েছে বোর্নিয়ো, আসাম, সুমাত্রা এবং ব্রহ্মদেশ। চতুর্থ অঞ্চলের য়েছে সুমেরু বৃত্ত অঞ্চল।

পেট্রোলিয়ম এক প্রকার খনিজ তৈল। মাটি থেকে অনেক নীচে যেখানে বালির স্তর আছে, সেই বালির স্তর থেকে পেট্রোলিয়ম তোলা হয়। প্রথম অবস্থায় অপরিস্কার, দুর্গন্ধ যুক্ত পেট্রোলিয়ম তোলা হয়। পরে তা বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় শোধন করতে হয়।

পেট্রোলিয়মের সন্ধান প্রাচীন কাল থেকেই পাওয়া গিয়েছে। তিন হাজার খৃস্টপূর্বাব্দে ইউফ্রেটিস নদীর উপত্যকার মেসোপটেমিয়ার (ইরাক) লোকেরা অ্যাসফাল্ট ব্যবহার করতো। অ্যাসফাল্ট পেট্রোলিয়ম জাতীয় পদার্থ। ১৮৫৯ সাল পেট্রোলিয়ম শিল্পের বিশেষ বছর। 'রক অয়েল কোম্পানী'র বিজ্ঞানী ড্রেক (Drake) ঐ বছর টিসুভিলাতে তেলের খনি খনন করেন। প্রায় সত্তর ফুট খুঁড়তেই তেল পাওয়া যায়। তার পরই টিসুভিলা পেট্রোলিয়ম শিল্পের একটি শহর হয়ে ওঠে।

পেট্রোলিয়মের উৎপত্তি সম্পর্কে ভূ-বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে। আমি এখানে দুজন বিজ্ঞানীর-মত তুলে ধরছি। বিজ্ঞানী পোটনীর মত, প্রাচীন কালে সমুদ্রে শ্যাওলা প্রভৃতি জলজ উদ্ভিদ্ বালির নীচে আশ্রয় পায়। সেইসব উদ্ভিদ্ জীবাণুর বিক্রিয়ায় পঁচে পেট্রোলিয়ম উৎপাদন করেছে। বিজ্ঞানী টাইবস্-এর পরীক্ষার পরে কয়েকজন বিজ্ঞানীর মত—সমুদ্রের তলায় উদ্ভিদ্ ও প্রাণী উভয়েই রূপান্তরিত হয়ে পেট্রোলিয়ম-এর সৃষ্টি করেছে।

বেলে পাথর আর চুনা পাথরের স্তরে পেট্রোলিয়মের

চিত্র-১

চিত্র-২

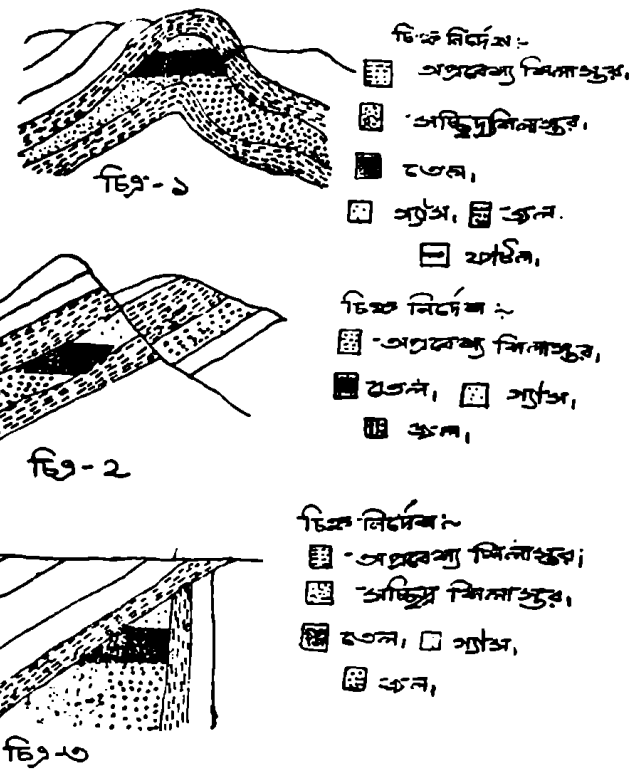

চিত্র-৩

॥ তৈল খনিতে তেলের এবং শিলাস্তরের বিভিন্ন প্রকার অবস্থান ॥

অবস্থান। পেট্রোলিয়মের উপাদান হাইড্রোকার্বন যা হাইড্রোজেন ও কার্বন-এর মিশ্রণে গঠিত।

পেট্রোলিয়ম শোধন কি ভাবে করা হয়?

বালির স্তর থেকে বাদামী রঙের অপরিস্কার পেট্রোলিয়ম তোলা হয়। কাদা মাটি আর তেল আলাদা করার জন্য বড় বড় পাত্রে অশুদ্ধ পেট্রোলিয়ম গরম করলে কাদা পাত্রের তলায় চলে যায় আর তেল উপরে উঠে আসে। এইভাবে পেট্রোলিয়ম শোধন করা হয়।

এবার কিভাবে পেট্রোলিয়ম উত্তোলন করা হয় জানা দরকার। ভূগর্ভে পেট্রোলিয়ম খনির উপরে থাকে তৈল ক্ষেত্র। এই পেট্রোলিয়ম উত্তোলনের জন্য সাধারণতঃ ২,৫০০/৩,০০০ থেকে ২৫,০০০/৩০,০০০ ফুট গভীর নল কূপ ড্রিলিং পদ্ধতিতে তৈলক্ষেত্রের উপর ১৫০ ফুট উঁচু কাঠের কাঠামোর মধ্যে বসানো হয়। ভূগর্ভে পেট্রোলিয়ম এবং গ্যাস অত্যধিক চাপের মধ্যে থাকার ফলে নল বসাবার সঙ্গে সঙ্গে উঠে আসে তেল, কিন্তু চাপ কমে গেলে পাম্পের সাহায্য নিতে হয়। এইভাবে খনি থেকে পেট্রোলিয়ম তোলা হয়।

পেট্রোলিয়ম খুঁজে বের করা কষ্টের ব্যাপার। পাথরের ফাটল দিয়ে তেল বেরুতে দেখা গেলে অনুমান করা হয় সে জায়গায় পেট্রোলিয়ম খনি আছে।

আমেরিকায় সবচেয়ে বেশী পেট্রোলিয়ম উৎপাদন হয়। উৎপাদন-এর দিক দিয়ে দ্বিতীয় রাশিয়া, ভেনেজুয়েলা, মেক্সিকো এবং ইরান। এবার ভারতবর্ষের পেট্রোলিয়ম-এর কথায় আসা থাক। ভারতে পেট্রোলিয়ম খুবই কম উৎপাদন হয়। ডিগবয়ে সামান্য পরিমাণে পেট্রোলিয়ম পাওয়া যায়। জ্বালামুখীতে অম্বিকা দেবীর মন্দিরের কুণ্ড থেকে দাহ্য গ্যাস বের হয়। ইহা পেট্রোলিয়ম উদ্ভূত। ভারত সরকারের রিপোর্ট নাগাভূমিতে একটি তৈল খনি আবিষ্কৃত হয়েছে। বর্তমানে পৃথিবীতে পেট্রোলিয়মের চাহিদা বাড়ছে এবং আশা করা যাচ্ছে ভবিষ্যতে আরও অনেক পেট্রোলিয়ম খনি আবিষ্কৃত হবে এবং পৃথিবীতে পেট্রোলিয়মের চাহিদা আরো বাড়বে।

নব ব্যারাকপুর উচ্চ বালক বিদ্যালয়, ২৪ পঃ

ভেবে বল—কোন্‌টা ঠিক ?

শ্রীঅনিলকুমার ঘাঁটা

১। একই পরমাণুক্রমাঙ্ক (Atomic number) অথচ ভিন্ন ভরসংখ্যা (Atomic mass) বিশিষ্ট একই মৌলের ভিন্ন ভিন্ন পরমাণুগুলিকে বলা হয় (ক) আইসোটোপ (খ) আইসোবার, (গ) আইসোমার।

২। (ক) পেঁয়াজ, (খ) আদা, (গ) রসুন-কে রাশিয়ান পেনিসিলিন (Russin penicillin) বলা হয় উহার (ক) অ্যান্টিটক্সিক (antitoxic), (খ) অ্যান্টিবায়োটিক (antibiotic), (গ) অ্যান্টিটিউমার (antitumour) গুণের জন্য।

৩। প্রভুগ্রন্থি (master gland) বলা হয়—(ক) পিটুইটারী, (খ) থাইরয়েড, (গ) অ্যাড্রেন্যাল—কে।

৪) ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট—'oscillaria Malarae'-র আবিষ্কর্তা হলেন (ক) রোনাল্ড রস, (খ) রবার্ট কক্‌।

(গ) চার্লস লুইস আলফোন্‌স্‌ ল্যাভেরান (Charles Louis AlPhonse Laveran)।

৫। বংশগতির একক (Unit) হোল—(ক) ডি. এন. এ (D. N. A)।

(খ) জীন (Gene), (গ) ক্রোমোজোম (Chromosome)।

৬। হৃৎপিণ্ড (Heart) যে ঝিল্লীর দ্বারা আবৃত থাকে তার নাম—(ক) পেরিটোনিয়াম, (খ) পেরিনিয়াম, (গ) পেরিকার্ডিয়াম।

৭। (ক) আয়োডিন, (খ) ভিটামিন 'K', (গ) আয়রন-এর অভাবে গলগণ্ড (Goitre) রোগ দেখা দেয়।

৮। ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু বহন করে (ক) কিউলেক্স, (খ) অ্যানোফিলিস, (গ) এডিস (Aedes) মশা।

৯। (ক) ইনসুলিন, (খ) গ্লুকাগন, (গ) গ্যাস্ট্রিন ক্ষরিত হয় লাংগারহান্‌স্‌ বর্ণিত কোষদ্বীপের বিটা (B) কোষ হ'তে।

১০। একটি স্নায়ুকোষ (Neuron)-এর অ্যাকসন (Axon) ও অন্য একটি স্নায়ুকোষের (Dedran)-এর সংযোগস্থলকে বলা হয় (ক) সাইন্যাপসিস, (খ) সাইন্যাপস, (গ) সেন্টোমিয়ার।

১১। রাতকানা (Night blindness) রোগের প্রধান কারণ হল শরীরে (ক) ভিটামিন 'সি' (খ) ভিটামিন 'ডি' (গ) ভিটামিন 'এ' র ঘাটতি।

১২। পরমাণু বোমার আবিষ্কারক (ক) অটোহ্যান, (খ) লিজে মাইট্‌নার।

সমাধান ঃ

১। (ক), ২। (গ), (খ), ৩। (ক), ৪। (গ), ৫। (খ), ৬। (গ), ৭। (ক), ৮। (খ), ১০। (খ), ১১। (গ), ১২। (খ)।

নোতুক বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির
পোস্ট ঃ নোতুক, জেলা ঃ মেদিনীপুর

অঙ্ক ধাঁধার মজার বাধা

স্নিগ্ধ মজুমদার

যেমন ফুচকার সাথে তেঁতুলজল, মাথা ব্যথার সঙ্গে অ্যানাসিন. বড়দিনের সাথে কেক, তেমনি সম্পর্ক হল অঙ্ক আর ধাঁধার। মজার ব্যাপার হল এই যে যদিও অঙ্কের সঙ্গে ধাঁধার কোন সম্পর্ক নেই, তবু এরা একে অপরের উপর নির্ভরশীল। আর এদের বাধা পেরোনো যেমন শক্ত, আবার তেমনই সোজা। আর জীবনের সবক্ষেত্রেই তো তোমাকে অঙ্ক প্রভৃতির বাধা পেরোতেই হবে, প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য। তাই এখানে অল্প কয়েকটা মজার অঙ্কের ধাঁধা দেওয়া হল।

প্রথম ধাঁধা :—এক সেকেণ্ড, বড় জোর এক মিনিট দেওয়া যেতে পারে এই ধাঁধাটার উত্তর বলতে। দারুণ সোজা কিন্তু।—"এমন একশোটা শব্দ বলো, ইংরেজীতে, যাতে, 'A' ভাওয়েলটা নেই। ডিক্সনারী খুললে অবিশ্যি সহজেই বেরিয়ে যাবে। কিন্তু তোমার জন্য বরাদ্দ সময়—প্রতি 'word' বা শব্দের জন্য এক সেকেণ্ড।

দ্বিতীয় ধাঁধা :—হরিবাবু হলেন পাড়ার সবচেয়ে পাগলাটে লোক। মস্ত বড় অংকবিদ তিনি। তাঁকে সেদিন জিগেস করেছিলাম—'আজ কি বার?' উত্তর এল 'আগামী পরশু যেদিন গতকাল হবে, সেদিন আজ থেকে রবিবার যতদূরে থাকবে, গত পরশু সেদিন আগামীকাল ছিল, সেদিন আজ থেকে রবিবার ঠিক ততটাই দূরে ছিল।

মাথাটা বোঁ বোঁ করে ঘুরে গেল। বলতে পারো সেদিন, কি বার ছিল?

তৃতীয় ধাঁধা :—শূন্যস্থানে উপযুক্ত সংখ্যা বসাও।

১২, (১০), ১৮

২৪ (?) ১

চতুর্থ ধাঁধা :—নিচের বাক্যগুলির মধ্যে প্রত্যেক জোড়া শূন্যস্থানের প্রথমটায় যে শব্দ বসবে, দ্বিতীয় স্থানে ঠিক তার আকৃতিগত উল্টো শব্দ বসবে।

(উদাঃ কাটা টাকা টা অচল।)

(ক) ——,কাজ কর।

(খ) অনেক——দুলিয়ে চলে।

(গ) ইলেকট্রিকের——এ চুরি হচ্ছে কেন?

(ঘ) ——এবং——গায়ক এসে গেছেন।

(ঙ) ——এবং——ওই গাছটায় থাকে।

পঞ্চম ধাঁধা :—এই ধাঁধাটা দেশলাইয়ের কাঠির। ব্যাপারটা হল এই যে, পাঁচটি কাঠি দিয়ে চৌদ্দ

বানাতে হবে। এক রকম নিচে দেখিয়ে দেওয়া হল। আরেক রকম ভাবে বানাতে পারবে নিশ্চয়ই।

দেওয়া পন্থা : ব্যস, এবার যোগ করে দাও। উপরে এগারো, নিচে তিনটে এক—মিলে তিন। টোটাল চোদ্দ।

কিন্তু অন্য পন্থাটা কি ভাবো তো?

উত্তর : **প্রথম ধাঁধা :**—One, two, three, এভাবে Hundred পর্যন্ত শব্দগুলির কোনটাতে "A" নেই।

দ্বিতীয় ধাঁধা :—রবিবার

তৃতীয় ধাঁধা :—নিখোঁজ সংখ্যা হল 'এগারো' (১১)

চতুর্থ ধাঁধা :—(ক) কথা, থাক (খ) রকম, মকর, জলে, লেজ (গ) তার, রাত (ঘ) নর্তকী, কীর্তন (ঙ) পিক কপি।

পঞ্চম ধাঁধা :—রোমান কায়দায় 'পাঁচকাঠি'তে চোদ্দ বানানো যায়।

পাঠভবন হাইস্কুল, কলিকাতা-১৯

কয়েকটি যন্ত্রের নাম

সুবীরকুমার দাস (দ্বাদশ শ্রেণী)

1) বায়ুর আর্দ্রতা পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রের নাম হাইগ্রোমিটার (Hygrometer)

2) সাগরের গভীরতা পরিমাপের যন্ত্রের নাম ফ্যাথোমিটার (Fathometer)

3) তরলের পৃষ্টটান পরিমাপের যন্ত্রের নাম টেন্‌সিওমিটার (Tensiometer)

4) জলের স্ফুটনাঙ্ক নির্ণয়ের যন্ত্রের নাম হিপসোমিটার (Hypsometer)

5) বায়ুমণ্ডলীয় চাপ পরিমাপের যন্ত্র ব্যারোমিটার (Barometer)

6) সময় পরিমাপের যন্ত্র ক্রোনোমিটার (Chronometer)

7) দুধের বিশুদ্ধতা নির্ণয়ের যন্ত্রের নাম ল্যাক্টোমিটার (Lactometer)

8) ভূমিকম্প নির্ণায়ক যন্ত্র সিস্‌মোগ্রাফ (Seismograph)

9) বর্ণ (colour)-এর উজ্জ্বলতা পরিমাপের যন্ত্রের নাম ক্রোমোমিটার (Chromometer)

10) অত্যন্ত ক্ষুদ্র বস্তু দেখবার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্র মাইক্রোস্কোপ (Microscope)

11) গ্যাসের আয়তন পরিমাপের যন্ত্র ইউডিয়োমিটার (Eudiometer)

12) যান্ত্রিক শক্তিকে তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করতে ব্যবহৃত যন্ত্রের নাম ডায়নামো (Dynamo)

13) তরলের ঘনত্ব পরিমাপের যন্ত্র হাইড্রোমিটার (Hydrometer)

14) সান্দ্রতা পরিমাপের যন্ত্র ভিস্কোমিটার (Viscometer)

15) গোলাকৃতি তলের বক্রতা পরিমাপের যন্ত্র স্ফেরোমিটার (Spherometer)

16) বাষ্পীয় চাপ পরিমাপের যন্ত্র টেন্‌সিমিটার (Tensimeter)

17) যানের (Vehicle) গতি পরিমাপের যন্ত্র স্পিডোমিটার (Speedometer)

18) দেহের উত্তাপ পরীক্ষার যন্ত্র থার্মোমিটার (Thermometer)

19) উদ্ভিদের জীবনীশক্তি বোঝার যন্ত্র ক্রেস্কোগ্রাফ (Crescograph)

20) হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের গতি পরীক্ষা করার যন্ত্রের নাম স্টেথোস্কোপ (Stethoseope)

21) রক্তচাপ (Blood pressure) মাপবার যন্ত্র স্ফিগমোম্যানোমিটার (Sphygmomanomcter)

22) বহুদূরের বস্তু দেখবার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রের নাম টেলিস্কোপ (Telescope)

23) তাপ বিকিরণ পরিমাপের যন্ত্র রেডিওমিটার (Radiometer)

24) উড়োজাহাজ ও যন্ত্রচালিত নৌকার গতি নির্ধারণের যন্ত্র ট্যাকোমিটার (Tachometer)

25) বায়ুর গতি ও বল পরিমাপের যন্ত্র অ্যানিমোমিটার (Anemometer)

---

১০৭ উল্টাডাঙা মেইন রোড, কলিকাতা-৬৭
সি. আই. টি বিল্ডিংস, ফ্ল্যাট ৩৪, ব্লক ৪

হারুলের বিজ্ঞান-ভাবনা

শ্রীবেন বল

বিজ্ঞান বিচিত্রা

অনীশ দেব

বুদ্ধি মাপে কেমন করে ?

তোমরা হয়তো জানো, সব মানুষের বুদ্ধি সমান হয় না। হেরফের থাকে কমবেশি। সুতরাং কার বুদ্ধি কম, কার বুদ্ধি বেশি সেটা বোঝা যাবে কেমন করে ? কি করে মাপা যায় এই বুদ্ধি ? এই প্রশ্ন নিয়ে বিজ্ঞানীরা মাথা ঘামাতে লাগলেন। অবশেষে ১৯০০ সাল নাগাদ আলফ্রেড বিনেট নামে জনৈক মনোবিজ্ঞানী একটা পথ বের করলেন। তাতে কয়েকটি বিশেষ পরীক্ষার মাধ্যমে কোন মানুষের 'মানসিক বয়স' অথবা MENTAL AGE হিসেব করে বের করা হলো। বলা হলো, সেটাই মোটামুটি বুদ্ধির মাপ।

আই. কিউ. অথবা ইনটেলিজেন্স কোশেণ্ট (INTELLIGENCE QUOTIENT) কথাটা তোমাদের নিশ্চয়ই খুব জানা। হ্যাঁ, আজকাল বুদ্ধি মাপতে আই. কিউ-র হিসেবটাই ব্যবহার করা হয়। বলা হয়, কারো আই. কিউ ৯০, কারো বা ১২০, এমন আরো কতো সংখ্যা। এই সংখ্যা যার ক্ষেত্রে যতো বেশি, সে ততো বেশি বুদ্ধিমান। এ খবরটাও তোমরা অনেকেই হয়তো রাখো। কিন্তু এই সংখ্যাটা কিভাবে হিসেব করে বের করা হয়, সেকথা জিজ্ঞেস করলে তোমরা হয়তো মুখ চাওয়া-চাওয়ি করবে। এমন কি বড়োরাও অনেকেই হয়তো মাথা চুলকোতে শুরু করে দেবেন। তাহলে এসো, এবারে এই হিসেবের ব্যাপারটাই খুব সহজ কায়দায় খতিয়ে দেখা যাক।

মনে করা যাক, বিনেটের হিসেবে কোন ছেলের মানসিক বয়স ধরো বের করা হলো। দেখা গেলো সেটা দশ বছর। ধরো, দ্বিতীয় আর একটি ছেলের বেলায়ও পরীক্ষার ফল পাওয়া গেলো দশ বছর। তাহলে আমরা বলবো দুটো ছেলেরই বুদ্ধি সমান—অর্থাৎ, মানসিক বয়স একই : দশ বছর। কিন্তু এর থেকে কি বোঝা যাচ্ছে দুটি ছেলের মধ্যে কে বেশি বুদ্ধিমান ? মোটেই না। কারণ দুজনের আসল বয়েস না জানলে সেটা বলা সম্ভব নয়। ধরো, প্রথম ছেলেটির বয়েস ছিলো চোদ্দ বছর, আর দ্বিতীয় ছেলেটির বয়েস ছিলো আট বছর। এবার নিশ্চয়ই আমরা বলতে পারি, আট বছরের ছোট ছেলেটি চোদ্দ বছরের ছেলেটির তুলনায় অনেক বেশী বুদ্ধিমান। কারণ, মাত্র আট বছর বয়েসেই তার বুদ্ধি চোদ্দ বছরের বয়েসের কোন ছেলের বুদ্ধিতে পৌঁছে গেছে।

সুতরাং বিনেটের পদ্ধতিতে বুদ্ধি মাপা সম্ভব, কিন্তু তার তুলনামূলক বিচার করা সম্ভব নয়। এরকম বিচার করতে গেলে মানসিক বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আসল বয়েসটাও জানতে হবে আমাদের। তখন ভাবনা-চিন্তা করে. এমন একটা পথ বের করা হলো, যাতে বুদ্ধির মাপ হিসেব করতে গেলে মানসিক বয়েসের সঙ্গে আসল বয়েসটাও জুড়ে দেওয়া যায়। তাতে কে কার চেয়ে কতোটা বেশি বুদ্ধিমান তার একটা তুলনামূলক মান পাওয়া যায়। এবারে সেই আধুনিক হিসেবের নিয়মটাই শিখে নাও। যার নাম দেওয়া হলো ইনটেলিজেন্স কোশেণ্ট বা সংক্ষেপে আই. কিউ (IQ)। এটা শুধুই একটা সংখ্যা. এবং বের করতে হয় মানসিক বয়সকে আসল বয়েস দিয়ে ভাগ দিয়ে। অর্থাৎ,

$$\text{আই-কিউ} = \frac{\text{মানসিক বয়স}}{\text{আসল বয়েস}}$$

সুতরাং যে দুটি ছেলের বুদ্ধি একটু আগে আমরা মেপেছিলাম, তাদের আই. কিউ কতো হবে একটু অঙ্ক কষে দেখা যাক।

প্রথম ছেলেটির ক্ষেত্রে,

$$\text{আই. কিউ} = \frac{১০}{১৪} = ০\cdot৭১$$

এবং দ্বিতীয় ছেলেটির ক্ষেত্রে,

$$\text{আই. কিউ} = \frac{১০}{৮} = ১\cdot২৫$$

আই. কিউ সংখ্যাটা আসলে দশমিক হলেও সেটা দশমিক তুলে দিয়ে প্রকাশ করাটাই আধুনিক রীতি। ফলে প্রথম জনের আই. কিউ একাত্তর ও দ্বিতীয় জনের আই. কিউ একশো পঁচিশ। অর্থাৎ, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, দ্বিতীয় ছেলেটি অনেক বেশি বুদ্ধিমান।

যদি কারো মানসিক বয়স আর আসল বয়েস হুবহু সমান হয় তাহলে তার আই. কিউ কতো হবে নিশ্চয়ই জানো ? হ্যাঁ, একশো। কারণ. কোন দশ বছরের ছেলের মানসিক বয়সও যদি দশবছর হয় তাহলে তার আই.

$$\text{কিউ} = \frac{১০}{১০} = ১\cdot০০ \text{ বা } ১০০।$$

সুতরাং যার আই. কিউ ১০০ তাকে আমরা সাধারণ

বুদ্ধির মানুষ বলতে পারি। একশোর কম হলে সাধারণের চেয়ে কম বুদ্ধি, এবং একশোর বেশি হলে সাধারণের চেয়ে তার বুদ্ধি হবে বেশি।

একটা খবর তোমাদের বলতে পারি, তবে শুনলে হয়তো প্রথমে খুবই দুঃখ পাবে। পনেরো থেকে আঠেরো বছরের পর আমাদের বুদ্ধি আর একটুও বাড়ে না। একই থেকে যায়। বিশ্বাস করো, পরীক্ষা করে এই সত্যিটা অনেক দুঃখের সঙ্গেই প্রমাণ করেছেন বিজ্ঞানীরা। তবে বিশেষ মনমরা হওয়ার কারণ নেই। কারণ, যেটুকু বুদ্ধি হওয়ার সেটুকু খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাওয়াই ভালো। তাহলে সেই বুদ্ধি নিয়ে বাকি জীবনটা আমরা কাজ করার সুযোগ পাবো। ধরো, পনেরো বছরে একজনের বুদ্ধি একদম শেষ ধাপে পৌঁছে গেলো। তারপর আর বাড়লো না। কিন্তু আর একজনের বুদ্ধি সময় নিলো পনেরো বছরের বদলে পঞ্চাশ বছর। অর্থাৎ, পঞ্চাশ বছর ধরে খুব ধীরে ধীরে বেড়ে চললো। তাহলে কিন্তু সর্বোচ্চ বুদ্ধির মাপ সমান হলেও প্রথমজন দ্বিতীয়জনকে বুদ্ধিতে টেক্কা দিয়ে যাবে সারা জীবন ধরেই। সুতরাং তাড়াতাড়ি বুদ্ধি বেড়ে যাওয়াটা আমাদের পক্ষে সব দিক দিয়েই ভালো।

এই কারণেই বিজ্ঞানীরা মোটামুটি ঠিক করেছেন, কারো বয়েস পনেরো বছর পেরিয়ে গেলেও আই. কিউ হিসেব করার সময় তার বয়েস পনেরো বলেই ধরা হবে। অর্থাৎ, কোন চল্লিশ বছরের মানুষের মানসিক বয়েস যদি পনেরো হয়, তাহলে তার আই. কিউ হবে,

$$\text{আই. কিউ} = \frac{১৫}{১৫} = ১·০০ \text{ বা } ১০০$$

অর্থাৎ, তার আসল বয়েস চল্লিশ না ধরে পনেরো ধরেই হিসেব করতে হবে।

ব্যস, এবার তো সব জেনে গেলে আই. কিউ সম্পর্কে। এখন তোমরা সহজেই নিজেদের আই. কিউ বের করতে পারবে, যদি মানসিক বয়সটা কোন পরীক্ষার মাধ্যমে আগে বের করতে পারো। মনে রাখবে, এই মানসিক বয়স মাপার জন্য বিভিন্ন পরীক্ষা প্রচলিত আছে। আর খুঁজলে তার বইও হয়তো পেয়ে যেতে পারো।

এবারে কতো আই. কিউ হলে বুদ্ধি কিরকম হয়, তার একটা মোটামুটি হিসেব পাশে দিলাম তোমাদের সুবিধের জন্য।

	আই. কিউ	বুদ্ধি
১	একশো চল্লিশ বা তার ওপরে	শতকরা একজন এইরকম প্রতিভাধর হয়
২	একশো কুড়ি থেকে একশো উনচল্লিশ	অত্যন্ত বুদ্ধিমান। শতকর দশজন পাওয়া যায়।
৩	একশো দশ থেকে একশো উনিশ	মোটামুটি বুদ্ধিমান। শতকরা ষোলোজন দেখা যায়।
৪	নব্বই থেকে একশো নয়	সাধারণ। শতকরা ছেচল্লিশ জন দেখা যায়।
৫	সত্তর থেকে উননব্বই	সাধারণের চেয়ে বোকা। শতকরা চব্বিশ জন।
৬	সত্তরের নীচে	মানসিকভাবে অসুস্থ। শতকরা তিনজন

মানুষ যদি দৈত্য হতো !

অনেক কল্পবিজ্ঞানের গল্পে তোমরা হয়তো দেখে থাকবে, কোন একটা ওষুধ খেয়ে বা ইঞ্জেকশান নিয়ে কোন মানুষ হয় বিশাল দৈত্য হয়ে যাচ্ছে, কিংবা ক্ষুদে পিঁপড়ে হয়ে যাচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে একটা কথা হয়তো কেউ খেয়াল করে না, যে কোন স্বাভাবিক মানুষের আকার বড় কিংবা ছোট করতে গেলে বেশ খানিকটা অসুবিধে আছে। অসুবিধেটা কি সেটাই এবার তলিয়ে দেখা যাক।

ধরো, একটা মানুষকে তিনগুণ বড় করে দেওয়া হলো। এই তিনগুণ বড় হওয়ার অর্থ, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা, তিনদিকেই সে তিনগুণ করে বাড়বে। তার পুরোনো আয়তন ছিলো, দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা। এখন তিনটে মাপই তিনগুণ করে বেড়ে গেলে মানুষটার নতুন আয়তন হবে পুরানো আয়তনের সাতাশ গুণ (অর্থাৎ, ৩ × ৩ × ৩)। যদি ধরা যায়, তার রক্ত-মাংস-হাড় ইত্যাদির ঘনত্ব একই থাকবে, তাহলে তার নতুন ওজন হবে আগের ওজনের ঐ সাতাশ গুণ।

এবারে দেখা যাক, এই তিনগুণ ওজন, অথবা আয়তন, বেড়ে যাওয়ার ফলে তার পেশী কিংবা হাড়ের জোর কতোটা বাড়বে। তোমরা জানো কোন জিনিসের

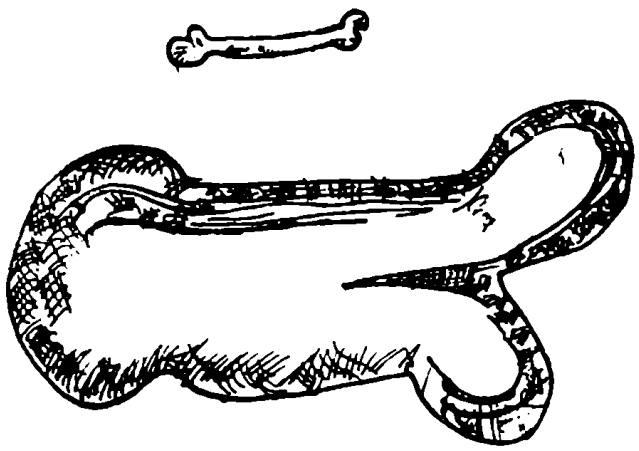

ইতালীয় বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিওর হাতে আঁকা স্কেচের নমুনা

ওজন বওয়ার ক্ষমতা বাড়ে তার তলের ক্ষেত্রফলের সঙ্গে। অর্থাৎ, হাড় অথবা পেশীর ক্ষেত্রে, সেই ক্ষমতা নির্ভর করবে তাদের প্রস্থচ্ছেদের (Cross-Sectional Area) ক্ষেত্রফলের ওপর। ধরা যাক, আমাদের হাড়টা চৌকো। তাহলে তার প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল হবে, দৈর্ঘ্য × প্রস্থ। অর্থাৎ, মানুষটা দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতায় তিনগুণ করে বড় হলে হাড়ের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল বাড়বে মাত্র ন'গুণ (অর্থাৎ, ৩×৩)। তার মানে মানুষটার সাতাশ গুণ ওজন তার হাড় ও পেশী মাত্র ন'গুণ জোরদার হয়ে হয়ে মোটেই ধরে রাখতে পারবে না। ফলে বেচারী দৈত্য-মানব ভেঙে পড়বে হাঁটু মুড়ে—এবং নিজের ওজনেই।

তাহলে এই সব দৈত্যদের দু'পায়ে খাড়া রাখতে গেলে কি করতে হবে? হয় তাদের হাড়গুলো আরও মজবুত জাতের কোন জিনিস দিয়ে তৈরী করতে হবে, নয়তো হাড়গুলোকে করতে হবে বেঢপ মোটা।

শুনলে অবাক হবে, এই তথ্যটি প্রথম আবিষ্কার করেন বিখ্যাত ইত্যালীয় বিজ্ঞানী গ্যালিলিও। কোন মানুষকে তিনগুণ বড় করলে তার ওজন ঠিকমতো বইবার জন্যে তার উরুর হাড়, অর্থাৎ, উর্বাস্থি (Thigh-bone) লম্বায় তিনগুণ বড় করেও কি পরিমাণ মোটা করা দরকার, সেটা একটা সুন্দর ছবি এঁকে দেখিয়েছিলেন গ্যালিলিও। ছবিটা উপরে দেওয়া হলো তোমাদের জন্য।

তেমনি কোন মানুষকে ছোট করে দিলে তার তুলনা-মূলক শক্তি বেড়ে যাবে। গ্যালিলিওর কথায়, 'একটা ছোট্ট কুকুর হয়তো নিজের মাপের দু-তিনটে কুকুরকে পিঠে তুলে নিতে পারবে, কিন্তু একটা ঘোড়া হয়তো নিজের মাপের একটা ঘোড়াকেও তুলতে পারবে না।'

সুতরাং, তোমরা যদি মানুষ-দৈত্য বা লিলিপুটদের নিয়ে কখনও গল্প লেখো, তাহলে খুব সাবধান হয়ে লিখবে কিন্তু!

স্বপনবুড়োর 'বুক অব নলেজ' থেকে

প্রথম বাঙালী পুরুষ

প্রথম বিলাত যাত্রা করেন কে?—রাজা রামমোহন রায়।
ভারতে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি কে?—উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
প্রথম লর্ড উপাধি পান কে?—লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ।
প্রথম নোবেল পুরস্কার কে পান?—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
প্রথম এ্যাডভোকেট কে?—স্যার রাজেন্দ্রনাথ মিত্র।
প্রথম প্রাদেশিক গভর্নর কে—লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ।
বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা কে লেখেন?—মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
প্রথম আই. সি. এস. কে?—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
প্রথম সার্জন জেনারেল কে কে?—মন্মথনাথ চৌধুরী।
প্রথম পৃথিবী ভ্রমণ কে করেন?—রামনাথ বিশ্বাস।
প্রথম কাউন্সিলের সদস্য কে?—গোবিন্দ গুপ্ত।
প্রথম কে. সি. এস. আই. কে?—রাধাকান্ত দেব।
প্রথম প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য কে?—আমীর আলি।
কলকাতার প্রথম মেয়র কে?—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস।
প্রথম এই. এম. এস. কে?—গুডিভ সূর্যকুমার
বাংলা শর্ট হ্যান্ড আবিষ্কার করেন কে?—দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ।
ব্যারিস্টারী পরীক্ষায় কে প্রথম হন?—স্যার হরেন্দ্রনাথ রকার।
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্রাজুয়েট কে?—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যদুনাথ বসু।
প্রথম স্যার উপাধি কে পান?—চন্দ্রমাধব ঘোষ
কলকাতার প্রথম শেরিফ্ কে?—দিগম্বর মিত্র।
এভারেস্টের উচ্চতা কে নির্ণয় করেন?—রাধানাথ শিকদার।

শ্রীঅখিল নিয়োগী-সঙ্কলিত

বিজ্ঞান ক্লাব-অন্বেষা

১৯৭৯-এর ১লা মে ২৪ পরগণার জেলার মসলন্দপুরের অন্বেষা বিজ্ঞান সংস্থা আত্মপ্রকাশ করে। এই সংস্থার উদ্দেশ্য—(১) বৈজ্ঞানিক মানসিকতা তৈরী করা (২) স্থানীয় পরিবেশের সমস্যাবলী নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাভাবনা করা (৩) বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে চিত্তাকর্ষক মডেল উপস্থাপিত করে সাধারণ মানুষকে আগ্রহী করে তোলা (৪) ভ্রমণের মাধ্যমে স্থানীয় উদ্ভিদ্, আবহাওয়া ও ভূতাত্ত্বিক গঠন সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা তৈরী করা। সর্বোপরি বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করে তোলাই ক্লাবের মূল লক্ষ্য।

বিজ্ঞান ক্লাবের কর্মপদ্ধতি নির্ধারণের জন্য অন্বেষা বিজ্ঞান সংস্থার সভ্যগণ সপ্তাহে একদিন মিলিত হন। প্রত্যেকে স্বনির্বাচিত বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন।

২২শে জুলাই শিক্ষামূলক ভ্রমণের উদ্দেশ্যে হাবড়া আদর্শ কৃষি খামার পরিদর্শন করেন।

আলোচনা চক্রে আলোচ্য বিষয় ছিল পরিবেশ ও দূষণ। পরিবেশের বিভিন্ন সমস্যাবলী নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়। এতে অংশ গ্রহণ করেন ডঃ বিনয় কান্তি দত্ত, শ্রীউষা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ও অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। 'প্রাচীন পৃথিবীতে বিজ্ঞান' বিষয়ক আলোচনায় বক্তব্য রাখেন ডঃ দীপঙ্কর রায়।

বার্ষিক বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে সংস্থা নিম্নোক্ত মডেলগুলি উপস্থাপিত করে ঃ—

আরসোলার পৌস্টিকতন্ত্র, জল-ঘড়ি, গ্রামীণ ফ্লাস্ক, ডায়নামো, ট্রানজিস্টার, সৌরজগৎ, মডার্ন হাউস, ওয়ারলেস, সাইরেন, সামুদ্রিক শামুক এবং পাথর ও খনিজ পদার্থ সংগ্রহ, খনি হইতে কয়লা উত্তোলন, পরিবেশ ও দূষণ, সিস্‌মোগ্রাফ, ম্যালেরিয়ার জীবাণুর জীবনচক্র,

১৯৮০ সালে বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী সভ্যগণ।

১৯৭৯ সালে ৩০মে ও ১লা জুন অন্বেষা বিজ্ঞান সংস্থা একটি বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করে। এই প্রদর্শনীতে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীরা অংশ গ্রহণ করে। ছোটদের নিয়ে বিজ্ঞান প্রদর্শনী এই অঞ্চলে এটাই প্রথম।

এই বছরে সংস্থার বিভিন্ন কার্যকলাপের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য—শিক্ষামূলক ভ্রমণ, আলোচনা চক্র, সর্ব ভারতীয় বিজ্ঞান ক্লাব সম্মেলনে যোগদান ও বার্ষিক বিজ্ঞান প্রদর্শনী।

সংস্থার কর্মকর্তারা সভ্যসভ্যাদের নিয়ে ১৯৭৯-এর Unba'anced eco-system for Agriculture ইত্যাদি।

১৯৮০ সালের জানুয়ারীতে সংস্থার আলোচনা চক্রে, 'সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ' বিষয়ে আলোচনা করেন ডঃ দীপঙ্কর রায়।

এই বছরেই ব্লক যুব উৎসবে বিজ্ঞান মডেল প্রতি-যোগিতায় যোগদান করে সংস্থা প্রথম স্থান দখল করে। মডেল ছিল 'সিস্‌মোগ্রাফ'। গোবর ডাঙ্গার মডেল প্রতি-যোগিতায় অংশ গ্রহণ করেও সংস্থা পুরস্কার লাভ করে।

অশোক নগরে বিজ্ঞান মডেল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে সংস্থা প্রথম হয়। মডেল ছিল—কালো ধোঁয়ার ব্যবহার। ইহা ছাড়া সংস্থা মিলনী স্কুলের রজত জয়ন্তী উৎসব ও ইস্পাত ক্লাবের বার্ষিক অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে যোগদান করে।

দুর্গাপূজায় বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে নিম্নোক্ত বিষয়ে সংস্থা মডেল উপস্থাপিত করে—বন্যা সতর্কীকরণ ইনকুবেটর, সেন্ট্রিফিউজ, নানুনে পাখি, স্বয়ংক্রিয় বৃষ্টি মাপক যন্ত্র, আধুনিক ফল বিপণি ডবল ইনটেনসিটি লাইট, থার্মোকাপল, এস. এল. ভি-৩ ও রোহিণী, পরিবেশ ও দূষণ, নিউক্লিয়ার রি-অ্যাক্টর, ভারতের জনসমস্যা ও তার সমাধান প্রভৃতি।

১৯৮১ সালে অন্বেষা বিজ্ঞান সংস্থা বিভিন্ন বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল জওহর শিশু ভবনে আয়োজিত সপ্তম রাজ্যভিত্তিক বিজ্ঞান প্রদর্শনী, কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে আয়োজিত ৫ম সারা বাংলা শিল্প ও বিজ্ঞান মেলা, বেঙ্গল ক্লাবের বার্ষিক অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান প্রদর্শনী। এই সমস্ত অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে সংস্থা কোন কোনটিতে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান লাভ করে।

বর্তমানে সংস্থার হাতে কয়েকটি প্রোজেক্ট রয়েছে। তন্মধ্যে স্থানীয় অঞ্চলে জনসংখ্যা কিভাবে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে সে সম্পর্কে সংস্থা তথ্য সংগ্রহ করছে। জন্ম ও মৃত্যুর হার সম্পর্কে demographical অনুসন্ধান চালাচ্ছে।

উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে প্রচুর পরিমাণ শস্য বীজ নষ্ট হয়ে যায়। এর প্রতিকারের জন্য সংস্থা বীজ সংরক্ষণের একটি প্রোজেক্ট নিয়েছিল। সংস্থা স্বল্প মূল্যে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য জনসাধারণের মধ্যে সরবরাহ করেছে। 'collection and study of local flora and fauna' প্রোজেক্টটিও সংস্থার হাতে রয়েছে।

ক্লাব চালাতে অন্বেষা বিজ্ঞান সংস্থা কিছু প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছে। এর মধ্যে প্রধান অসুবিধা হল—(১) অর্থনৈতিক (২) পৃষ্ঠপোষকের অভাব (৩) কাজের জায়গার অভাব ইত্যাদি। তবে সকলের সহযোগিতা ও শুভেচ্ছার মধ্য দিয়ে অন্বেষা বিজ্ঞান সংস্থা তার উদ্দেশ্য পূরণে এগিয়ে যাবার আশা রাখে।

(নিজস্ব প্রতিবেদক)

'ভেবে ভেবে বল'র উত্তর

১। ইঁদুর; (খ) ভোল (VOLE); (গ) শ্রু (SHREW) (ঘ) পাইক (PIKE)

(২) (১) করবীফুল; (২) ধুঁতরো ফুল

(৩) একটি শংকর। টিন (TIN) ও সীসা (LEAD) থাকে।

(৪) আমিষ জাতীয় খাদ্য

(৫) থোরিয়াম (THORIUM)

(৬) ভোঁদড় (OTTER)

(৭) দুজন বৈজ্ঞানিক 1976 সালে রসায়ণ নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন।

জুল ভর্ন-এর টোয়েন্টি থাউজেন্ড লীগস আন্ডার দি সী

উপন্যাসের চিত্ররূপ--

গৌতম কর্মকার

রহস্যময় এই ঘটনাটির শুরু ১৮৬৬ সালের মাঝামাঝি। সমুদ্রের বুকে এক অতিকায় প্রাণীর আবির্ভাবে মানুষ চমকে উঠেছিল সেদিন। যাত্রী এবং বণিকদের উত্তেজনা উত্তাল হয়ে উঠেছিল। তিমির চেয়ে অনেক অনেক বড় এই সামুদ্রিক প্রাণীটির আবির্ভাব আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্য সরকারগুলিকেও চঞ্চল করে তুলেছিল। মৎস্যবিজ্ঞানীদের জ্ঞানের গর্বকে এটি নির্মমভাবে আঘাত করেছিল সেদিন। দুর্বোধ্য এই প্রাণীটির অস্তিত্বের প্রথম প্রমাণ নিয়ে এসেছিল 'গভর্নর হিগিনসন'- ক্যালকাটা এণ্ড বার্ণাক স্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর একটি জাহাজ।

১৩ই এপ্রিল, ১৮৬৮। শান্ত সমুদ্রে ভেসে চলেছিল একটি জাহাজ–'স্কোশিয়া'। দ্রাঘিমাংশ ১৫°১২' ও অক্ষাংশ ৪৫°৩৭'-এ চলমান জাহাজটির তখন গতিবেগ ছিল ১৩ মাইল।
বিকেল চারটে বেজে সতেরো মিনিট। যাত্রীরা তখন পানভোজনে ব্যস্ত।
এ কী! কী হল?
কীসের এমন কাঁপুনি!?
জাহাজ ডুবছে, জাহাজ ডুবছে··· লাইফবোট–
আতঙ্কিত ক্যাপ্টেন অ্যান্ডারসন নেমে এলেন জাহাজের নীচে।
এ কী! ভেতরে জল ঢুকছে। সর্বনাশ! এমন ছিদ্র মেরামত করা সে সম্ভব নয়!
অপারেটর, পাম্পগুলোকে চালু করো সব। কেপ ক্লিয়ারে পৌঁছতেই হবে।
অবশেষে–তিনশো মাইল পাড়ি দিয়ে স্কোশিয়া কেপ ক্লিয়ারে পৌঁছলো।
পরীক্ষা করলেন বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ারের দল–
আশ্চর্য, মোটা লোহার পাতটাকে যেন কাগজের মত এফোঁড়-ওফোঁড় করেছে! এ কীসের কাজ?
কী এই দানব? মহাসমুদ্রের এই আতঙ্ক দূর হবে কবে? কেমন করে?
GOUTAM

ভেবে ভেবে বল

শুভব্রত রায়চৌধুরী

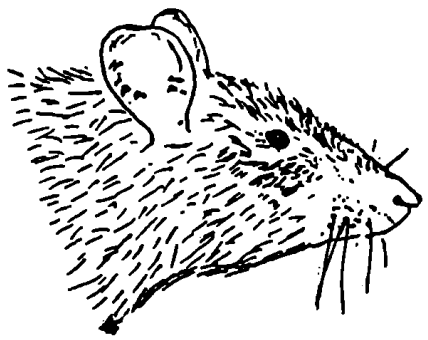

ক

খ

গ

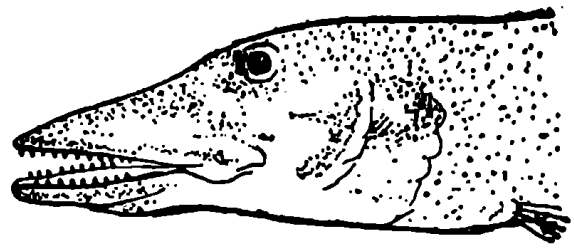

ঘ

[এক] ক থেকে ঘ পর্যন্ত ছবি দেখে নাম বল ঃ

[দুই] দুটি বিষাক্ত ফুলের নাম বল যেগুলো আমাদের ঘরের পাশেই পাওয়া যায়!

[তিন] পিউটার (PEWTER) কি জিনিস?

[চার] কোন জাতীয় খাদ্য খেলে আমাদের শরীরে এ্যামিনোএসিড তৈরী হয়?

[পাঁচ] একটি তেজস্ক্রিয় ধাতুর আনবিক সংখ্যা ৯০; ধাতুটির নাম বল?

৬। এক ধরণের লোমওয়ালা জন্তু—জলাশয়ের আনাচে-কানাচে মাছ, ব্যাঙ, সাপ ইত্যাদি ধরে খায়। ছবি দেখে নাম বলো ত?

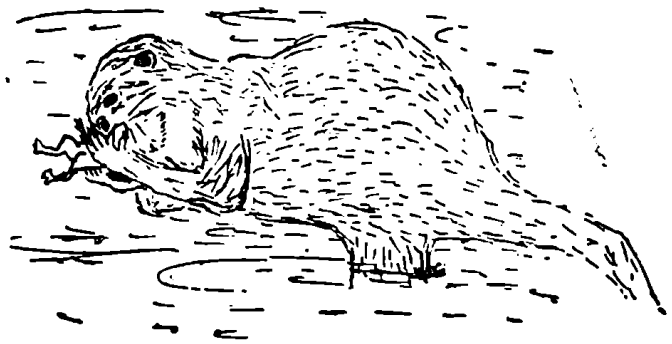

৭। দু'জনে বাস্তি Dr S. TING এবং Dr B. RICHER কি জন্য বিখ্যাত হয়েছিলেন?

উঃ ৬৯ পৃষ্ঠায়

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

নিয়মাবলী

গ্রাহকদের জন্য

- কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রতি ইংরাজী মাসের গোড়ায় প্রকাশিত হয়।
- প্রতি সংখ্যার মূল্য ২ টাকা। বারো মাসের বৈশাখ–চৈত্র গ্রাহক চাঁদা ২০ টাকা। শারদসংখ্যার মূল্য পৃথক।
- গ্রাহকদের ডাকমাশুল লাগবে না। **under certificate of posting**-এ গ্রাহকদের বই পাঠানো হবে। যারা রেজিস্ট্রী ডাকে নেবেন তাদের অতিরিক্ত ৩০ টাকা পাঠাতে হবে।
- **M. O.** বা **Bank Draft KISHORE JNAN-BIJNAN**-এর নামে পাঠাতে হবে।

এজেন্টদের জন্য

- ১০ কপির কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। কমিশন শতকরা ২৫ টাকা।
- ভি. পি. বা ব্যাঙ্ক মারফৎ পত্রিকা পাঠানো হবে। ডাক-মাশুল লাগবে না।
- এজেন্টদের অর্ডার অনুযায়ী সংখ্যা পিছু ১ টাকা করে অগ্রিম জমা রাখতে হবে।
- এলাকা ভিত্তিক এজেন্সীর জন্য সাক্ষাতে অথবা চিঠিতে যোগাযোগ করুন।

লেখকের প্রতি

- বিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং সর্বসাধারণের উপযোগী জনপ্রিয় বিজ্ঞানের রচনা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রকাশিত হবে। লেখার ভাষা ছোটদের উপযোগী এবং লেখার ভঙ্গি সহজবোধ্য হওয়া প্রয়োজন।
- ফুলস্ক্যাপ কাগজের একপিঠে বাঁদিকে মার্জিন রেখে স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লেখা পাঠাতে হবে।
- আনুমানিক শব্দসংখ্যা ২৫০০।
- লেখার সঙ্গে উপযুক্ত ছবি (লাইনড্রয়িং/হাফটোন)-যুক্ত থাকা প্রয়োজন।
- রচনার শেষে লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি যুক্ত থাকা প্রয়োজন।
- প্রকাশিত রচনার বিষয়ে সর্বপ্রকার দায়িত্ব লেখকের, কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান কর্তৃপক্ষের নয়।
- অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- যে কোন বিষয়ে আলোচনার জন্য সম্পাদকীয় দপ্তরে যোগাযোগ করতে হবে।

সম্পাদক : কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

ঘনাদা ও টেনিদার গল্প

প্রেমেন্দ্র মিত্র

ঘনাদার জুড়ি নেই	৫-০০
মঙ্গলগ্রহে ঘনাদা	৫-০০
ঘনাদা বিচিত্রা	১২-০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

টেনিদার অভিযান	১৫-০০
চারমূর্তি	৫-০০
ঝাউবাংলোর রহস্য	৫-০০
কম্বল নিরুদ্দেশ	৫-০০

বিজ্ঞান, বিজ্ঞানী ও কল্পবিজ্ঞান

জাতীয় জীবনীকার মণি বাগচি প্রণীত

বিশ্বের বিজ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার	১০-০০
মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন	৮-০০
আচার্য জগদীশচন্দ্র	৪-০০
বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ	৪-০০
পরমাণুবিজ্ঞানী ভাবা	৪-০০

সমরজিৎ কর

ভয়ংকর সেই অভিযান	১৫-০০
নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী	১৫-০০

স্ব ড়া

বুক অব নলেজ	১০-০০

সাধন দাশগুপ্ত

আলো আরও আলো	১৫-০০
রোমাঞ্চকর রসায়ন	১২-০০

অমরনাথ রায়

সংখ্যা নিয়ে খেলা	৫-০০
জ্ঞান-বিজ্ঞানের মজার খেলা	৫-০০

ছোটদের বই

বাঙালী রবিনহুডের কাহিনী

বাঙলার নবাবী আমল যখন শেষ, ইংরেজ কোম্পানীর আমল তখন শুরু। শাসনের মুঠি সবে কড়া হচ্ছে বন-বাদাড় প্রচণ্ডই আছে। ভাল রাস্তাঘাটও হয়নি। পথিক পথ চলতে ভয় পায়। গেরস্থের চোখে ঘুম নেই। কখন বুঝি হানা দেয়—'হাতে লাঠি মাথায় ঝাঁকড়া চুল, কানে তাদের গোঁজা জবা ফুল।' মুখে হা-রে-রে পিলে-চমকানো ডাক। তারাই বাঙলার ডাকাত। সেইসব কাহিনী জানা মানেই প্রাচীন বাঙলাকে জানা। এই বই লিখে যোগেন্দ্রনাথ হৈ চৈ ফেলেছিলেন। আবার সেই বই বেরুল।

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

বাঙলার ডাকাত	
চারখণ্ডে প্রকাশিত। প্রতি খণ্ড	৬-০০
মহিম ডাকাত	১০-০০

বিশু মুখোপাধ্যায়

বিখ্যাত দস্যুকাহিনী	৬-০০

জীবনচরিতমালা

দেশের শ্রেষ্ঠ মানুষদের জীবনকথা। অপরূপ ভাষায় লিখেছেন প্রখ্যাত জীবনীকার মণি বাগচি। ভূমিকা লিখেছেন ডঃ নীহাররঞ্জন রায়।

রাজা রামমোহন	৫-০০
যুগদেবতা রামকৃষ্ণ	৫-০০
শরৎচন্দ্র	৫-০০
পরমাপ্রকৃতি সারদামণি	৫-০০
আলোকময়ী শ্রীমা	৬-০০
বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ	৫-০০
জীবনীশতক	২৫-০০
সপার্ষদ শ্রীরামকৃষ্ণ	১০-০০

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ • ৮/১সি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা–৭০০০৭৩

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পক্ষে রবীন বল কর্তৃক ৮/১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা ৭৩ হইতে প্রকাশিত
এবং ৬ শিবু বিশ্বাস লেন, কলকাতা ৬, তাপসী প্রিন্টার্স হইতে মুদ্রিত। দাম তিন টাকা।
প্রচ্ছদমুদ্রণ: রূপসা এন্টারপ্রাইজ, ২০০ বি বি গাঙ্গলী স্ট্রীট, কলিকাতা ১২